ম
ধু
রা

ধ ন ঞ্জ য় বৈ রা গী

গ্র ন্থ ম্

২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৪
প্রথম গ্রন্থম সংস্করণ
১লা ফাল্গুন ১৩৬৫
১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

প্রকাশক :
প্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

একমাত্র পরিবেশক :
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ
১২।১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬

মুদ্রাকর :
যুগলকিশোর রায়
সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৭, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
অমলেন্দু সেন

এই লেখকের

উপন্যাস—এক মুঠো আকাশ

নাটক—ধৃতরাষ্ট্র

রুপোলী চাঁদ

? ? (যন্ত্রস্থ)

ছোট গল্প—ছিলেন বাবুর দেশে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অরুণা তারস্বরে চীৎকার করে অন্য ফ্ল্যাটের ঝি চাকরদের সঙ্গে ঝগড়া করে. এই, কেন তুই চৌবাচ্চার জল শেষ করেছিস্? এখন আমরা বাসন মাজি কি দিয়ে?

এ-ত নিত্যকার ঝগড়া। অরুণাদের দিকে তিনটে ফ্ল্যাটেব জন্যে নীচে একটি কল আর চৌবাচ্চা। সেখানে ঝি চাকরেরা বাসন মাজে, কাপড় কাচে, নিজেরা চান করে। অরুণাও এখানে বাসন মাজতে যায়, তাই দেখে ঝি চাকরেরা হাসাহাসি করে। উপরের ফ্ল্যাটের থরথরে হিন্দুস্থানী আয়া দেহাতী ভাষায় শুনিযে দেয়, তুমি আগে এলেই পার, কে তোমার জন্যে চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখবে?

এতেই অরুণা দপ করে জ্বলে ওঠে, ছোট লোকের মেয়ে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, আমাকে 'তুমি' বলে। যাকে কাছে পায় সালিসী মানে, নির্ম্মলকে দেখে ছাই হাতে চেপে ধরে, দেখেছ নির্ম্মলদা আজ আমি গরীব বলে ছোটলোকগুলোও চোখ রাঙাচ্ছে। বাবার যখন টাকা ছিল কত ঝি চাকর অমন রেখেছি। এ মুখপুড়িদের সে কথা বুঝিযে দাও না।

নিম্মল শান্তস্বরে বলে, মাথা গরম কোর না, ওপরে চল।

অরুণা ভেউ ভেউ করে কাঁদে, আমার কেউ নেই, বাবাগো তুমি আমায় ডেকে নাও।

কোন রকমে ভুলিয়ে নির্ম্মল তাকে ওপরে আনে। অরুণার মাকে আলাদা পেয়ে ধমক দিয়ে বলে, কেন আপনি অরুণাকে নীচে পাঠান! জানেন সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে—

অরুণার মা বেচারীর মত তাকান, কি করব বাবা, আমাদের আর

কে আছে। তবু অরুণা পারে, আমি পারি না। নিজের হাতে বাসন মাজা, কাপড় কাচা এ-যে স্বপ্নেও ভাবিনি। ভাঙাবাড়ীতে থাকতে হবে এ-ও কি কল্পনা করেছি—

কথা আর শেষ হয় না, গলা ধরে আসে। অবিরাম চোখের জল পড়ে।

নির্ম্মল নিজের ঘরে পালিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আজ কথাই ছিল মাসীমাদের বাড়ী তাড়াতাড়ি যাবে। রঞ্জিত তার বান্ধবীদের ডেকেছে। অনীতা, শোভনা এমনকি মার্জারী বোসও নাকি আসবে। নির্ম্মলের সঙ্গে আলাপ বেশীদিনের না হলেও মার্জারীর ব্যবহারে আড়ষ্ঠতা নেই মোটেই। প্রথমদিনই নির্ম্মলের পোষাকের তারিফ করে বলেছিল, রঙের জ্ঞান আপনার চমৎকার। বাদামী রঙের স্যুটের সঙ্গে এ ধরনের মেরুন টাই পরতে দেশী ছেলেদের আমি বড় একটা দেখিনি।

নির্ম্মল হেসে বলেছিল, ধন্যবাদ।

আজকেও পোষাক পরবার সময় নির্ম্মল নিজের অজান্তেই মেরুন টাইটা বেছে নেয়। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় বাঁধে।

সূর্য্য অস্ত গেছে, কিন্তু অন্ধকার এখনও নামেনি। ছোট ছেলেমেয়েদের আয়ারা প্র্যামে করে বেড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। নির্ম্মল দেখে রাতুল ঘোষ বেরোল সুজিত আর সুনীলের হাত ধরে। সামনের পার্কে বোধ হয় চক্কর দিয়ে আসবে। কোনদিকে তার হুঁশ নেই, ছেলেদের সঙ্গে গল্প করতে ব্যস্ত। নির্ম্মল মনে মনে ভাবে, এই লোকটা সংসারী হোল না যার সারা মনটাই পড়ে আছে সংসারের মধ্যে।

নির্ম্মল তৈরী হয়ে যখন নীচে নেমে এল রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। বেয়ারা ট্যাকসী ডাকতে গেছে। সেই অবসরে মণীশবাবুর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নির্ম্মল বৌদির সঙ্গে আলাপ করে।

—মণীশবাবু এখনও ফেরেন নি ?

—কলেজের ফেরত কোন লাইব্রেরীতে গেছেন বোধ হয়। তুমি কোথায় চল্লে?

—রঞ্জিতের পার্টিতে।

বৌদি স্মিত হাসেন, তাই বুঝি সাহেব সাজা হয়েছে। তারপর মা'রা কবে আসছেন?

—এই মাসটা কাটিয়ে।

বৌদি খুসী হন, তবে আর কি, ঘর দোর পরিষ্কার করে ভাল করে গুছিয়ে ফেল।

—আমি আবার কি করব, সব আপনাকে করতে হবে।

ট্যাক্সী এসে পড়ায় আর কথা হয় না, নির্ম্মল বেরিয়ে পড়ে।

চারতলা বিশাল প্রাসাদ। রাস্তার এক মোড় থেকে আর এক মোড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তারই মধ্যে খান কযেক ঘর নিয়ে এক একজনের ফ্ল্যাট। বাসিন্দারা দেশবিদেশের লোক। সকলের সঙ্গে সকলের চেনা পরিচয় খুব কম। কখানা কামরার মধ্যে এক-একজনের সাজানো সংসার। নিজেদের ঘরে বসে তারা পায়রার মত বকম্ বকম্ করে।

নির্ম্মল এ ধরনে মানুষ হয়নি, তবু তার মন্দ লাগে না। রাত্রি বেলা মাসীমার বাড়ী থেকে খেয়ে ফেরবার সময় এক একদিন মোড়ের পান-ওয়ালার দোকান থেকে সিগারেট ধরিয়ে সে এই বাড়ীটার দিকে ফিরে তাকায়। সারা বাড়ীটায় তিন চার রকমের রঙ, বুঝিয়ে দেয় এ এক-জনের সম্পত্তি নয়। এতগুলি শরিকের। ভাড়াটেদের ভাড়ায় যে যার নিজের অংশ সারিয়ে নিয়েছে, সেই মতই রঙ। তবে নির্ম্মলের পাশের ফ্ল্যাটের অংশটা অনেকদিন সারান হয় নি, বোধহয় মালিকের অবস্থা খারাপ। ছাদ দিয়ে জল পড়ে, জানালার শার্সিও অটুট নয়।

নির্ম্মল ঐ-দিকেই তাকায়। একতলা আর দোতলা অন্ধকার। শুধু ওপরের ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। ওইখানে অরুণারা থাকে। অল্প বয়সে মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে। একলা মা, অনেক সন্তান হারিয়ে এই পাগলী মেয়ে নিয়ে বসে আছেন। একটি মাত্র ছেলে, লেখাপড়া শেখেনি, সামান্য কাজ করে। ভাঙ্গা বলে অল্প ভাড়ায় ঘর পেয়েছে; ওদের পক্ষে মন্দ নয়।

নির্ম্মল বাড়ীর মধ্যে ঢোকে, ওর ফ্ল্যাট দোতলায়। সিঁড়ির মুখেই মণীশবাবুর সঙ্গে দেখা। অমায়িক হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর নির্ম্মল ভালো তো?

নির্ম্মল হাসে, মন্দ কি। আপনার?

মণীশবাবু হাতের বইটি তুলে ধরেন, 'টেম্পরারী ইন্‌স্যানিটি'। এখন এই বইটা ফলো করছি। দেখি যদি অরুণাকে সারাতে পারি।

—আপনি যেভাবে চেষ্টা করছেন মনে হয় মেয়েটা সেরে উঠবে।

মণীশবাবু ম্লান হাসেন, আমি মনস্তাত্ত্বিক, মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। মনোবিকারের উপর বক্তৃতা করতে পারি অনেক। তবে হাতে নাতে কিছু করতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না।

কথা শেষ না হতেই অভ্যাস মত হাত তুলে নমস্কার করে তিনি অন্য-মনস্কভাবে চলে গেলেন।

নির্ম্মল নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে নির্ম্মলের রোজই দেরি হয়। রাত্রে বাড়ী ফিরে অল্পবিস্তর পত্রিকার পাতা উল্টে শুতে কম রাত হয় না। তাই সকালবেলা চায়ের সঙ্গে কাগজ পড়ার সময় ঘড়িতে প্রায় আটটা বেজে যায়।

—ঘুম ভেঙ্গেছে আপনার?

নির্ম্মল চম্‌কে ওঠে। অরুণা কখন এসে দাঁড়িয়েছে, মুখে ম্লান হাসি।

—কি খবর তোমার, এস, বস।

অরুণা এগিয়ে এসে চেয়ারে বসে।

—আমি চা খাব।

কি-রকম বাধ বাধ কথা। তেষ্টাভরা চোখে নির্ম্মলের চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—নিশ্চয় খাবে, আমি তোমায় চা করে দিচ্ছি।

নির্ম্মল কাপে করে চা এগিয়ে দেয়। অরুণা চক্‌ চক্‌ করে চা খেয়ে ফেলে।

—উঃ কি গরম, বড্ড ঘাম হচ্ছে। পাখাটা খুলে দিন না।

নির্ম্মল হাসে, সর্দ্দারি করে গরম চা-টা খাবার কি দরকার ছিল।

অরুণা নিজেই উঠে এগিয়ে পাখা খোলে। নির্ম্মল তারই দিকে তাকিয়ে থাকে। অরুণার বয়েস বছর আঠাশ হবে।

সে যে সুন্দরী সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। ফরসা রঙ, ঋজু দেহ, সাবলীল ভঙ্গী। এক পিঠ চুল, খুব কালো না হলেও একেবারে বাদামী নয়। শুধু একটি মাত্র ত্রুটি তার রূপকে অনেকটা নষ্ট করে দিয়েছে সে তার চোখ। কেমন যেন ভ্যাবলা ঘোলাটে, সে চোখে কোন ভাষা নেই।

অরুণা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, আমার বরের কোন খবর পেলেন নির্ম্মলদা ?

—না, পাইনি। নির্ম্মল ছোট্ট উত্তর দেয়।

অরুণা জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি রোজ নজর রাখি। এ রাস্তা দিয়ে কোনো দিন গেলে তাকে চেপে ধরব।

নির্ম্মল নিরুত্তর। অরুণা বলে যায়, ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় না—

—কে ?

—কে আবার ? মা, দাদা।

—কেন ?

—কেউ আমার ভালো চায় না।

—এ তুমি কি বলছ ?

—ঠিকই বলছি। আমি জানি, আমি এখানে আছি শুনলে ও নিশ্চয় আসতো।

নির্ম্মল চুপ করে থাকে। অরুণা অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করে। হঠাৎ নিজে থেকেই বলে, আপনার তো বিয়ে, না নির্ম্মলদা ?

—কে বল্লে, আমি তো জানিনা।

—আমি জানি। আপনার দেরাজে ছবি আছে, বেশ দেখতে।

নির্ম্মল বোঝে মেয়ে পছন্দ করার জন্যে মা যে ছবি পাঠিয়েছেন তাই দেখেই অরুণা বিয়ের কথা ভেবেছে। হেসে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি করে জানলে ওখানে ছবি আছে ?

অরুণা কৌতুক বোধ করে, বা, আমি তো কত সময় আপনার ঘরে ঢুকে কাগজপত্র ঘেঁটে দেখি ?

—কি দেখ ?

অরুণার মুখ করুণ হয়ে যায়, যদি আমার বর কোন চিঠি আপনাকে লিখে থাকে। একটু থেমে বলে, বিয়ে হলে এখানে থাকবেন তো ?

—সকাল বেলা কি আজেবাজে বকৃছ ?

অরুণা জিদ ধরে বলে, সত্যি বলছি আমার বরকে তার আগে খুঁজে দিতে হবে। নইলে আমি একা কি করে থাকব।

নীচে থেকে মা ডাকাডাকি করছেন। অরুণা সাড়া দিয়ে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে যায়। আবার ফিরে এসে নীচু গলায় বলে, ওর খবর পেলে একেবারে আমার কাছে দিয়ে যাবেন, আর কাউকেও বলবেন না।

অরুণা চলে যায়।

বেচারী অরুণা। নির্ম্মলের দুঃখ হয়, ভাবে নিশ্চয় কোন বড় শক্ পেয়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। প্রথম যেদিন আলাপ হয়, অরুণা সেইদিনই বলেছিল, নির্ম্মলদা, আমার বর কোথায় হারিয়ে গেছে, খুঁজে দেবেন?

নির্ম্মল বুঝতে পারেনি, বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। অরুণার মা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন ওর মাথার ঠিক নেই। নির্ম্মল আর কোন কথা না পেয়ে বলেছিল, নিশ্চয় খুঁজে দেব।

সেই থেকে অরুণা প্রায়ই আসে, নির্ম্মলকে ওই একই কথা জিজ্ঞেস করে। মাঝেমাঝে ওর কথা শুনে নির্ম্মলের হাসি পায়, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনটা করুণায় ভরে যায়। ভাবে, ঈশ্বর এত রূপ দিয়ে কেন এত বড় ঠাট্টা করলেন অরুণার সঙ্গে।

কলকাতা নির্ম্মলের কাছে একরকম নতুন জায়গা বল্লেই হয়। স্কুল কলেজের জীবন তার কেটেছে বহরমপুরে। চাকরিতে ঢুকেও বাংলাদেশের বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে বেশী। বিদেশী তেল কোম্পানীতে কাজ, বছর দেড়েক হল বদ্‌লী হয়ে এসেছে কলকাতায়। মনে হয় এখানেই পাকাপাকি থাকতে হবে। সেই আশাতেই নিজে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে বাড়ীর সবাইকে বহরমপুর থেকে এখানে নিয়ে আসতে পারবে বলে। কলকাতায় এসে প্রথম ক'মাস কাটিয়েছে মাসীমার বাড়ীতে। মেসোমশাই নিবারণ সোম নামজাদা বিলাতী কোম্পানীর অংশীদার। ল্যান্সডাউনি পার্কে বাড়ী। ছোট্ট সংসারে নিখুঁত সায়েবিয়ানা। মাসীমা কিন্তু পুরো দস্তুর মেমসাহেব নন। এখনও তাঁর শোবার ঘরের এক কোণ থেকে সন্ধ্যেবেলা শাঁখ বাজে। দুপুরবেলা খেয়ে উঠে পান খান। সন্ধ্যেবেলা পান খাওয়া ঠোঁটের ওপর লিপষ্টিক্ লাগিয়ে পার্টিতে যান।

এদের বাড়ীতে থাকার কোন অসুবিধেই ছিল না নির্ম্মলের। তবু নির্ম্মলের ভাল লাগেনি। এ-বাড়ীর আবহাওয়ায় সে সব সময় অনুভব করেছে কৃত্রিমতার স্পর্শ। মাসীমা তাকে এতদিন ছাড়েন নি। বলেছেন, এ আবার কি কথা নির্ম্মল, কোলকাতায় এসে তুই হোটেলে থাকবি, দিদি শুনলে বলবে কি বল্‌তো?

নির্ম্মল হেসে উত্তর দেয়, তোমার সঙ্গে আর কতক্ষণ দেখা হয় মাসীমা, সকালে উঠেই তো অফিসের কাজে বেরিয়ে যাই, ফিরি সন্ধ্যেবেলা—

—ঐ রাত্তিরটাতেও তো একসঙ্গে খাওয়া হয়—

—তার মধ্যে অর্দ্ধেকদিনই তো তোমাদের পার্টি, বাইরে নেমতন্ন।

মাসীমা আহত স্বরে বলেন, আমিতো যেতে চাই না, উনি আবার না গেলে রাগারাগি করেন।

—বাঃ তোমরা যাবে না কেন? আমি বলছিলাম আমার অফিসের কাছাকাছি যদি কোথাও একটা জায়গা পাই তাহলে সুবিধে হয়। এম্‌নি না হয় সন্ধ্যেবেলা এখানেই আসব তোমরা যেদিন বাড়ী থাকবে।

তাতেও মাসীমা রাজী হননি। তবে যখন শুনলেন নির্ম্মলের মা'র কলকাতায় আসার ইচ্ছে সেই, জন্যেই নির্ম্মল আলাদা ফ্ল্যাট খুঁজছে তখন আর আপত্তির কোন কারণ না পেয়ে বল্লেন, একশর্তে তুমি বাড়ী ঠিক কর নির্ম্মল, যতদিন না দিদি কলকাতায় আসছেন রোজ রাত্রে তুমি আমাদের এখানে খাবে। এ প্রস্তাবে নির্ম্মল রাজী হয়েছে। সেইজন্যেই এই নতুন ফ্ল্যাট নেওয়ার পর থেকে প্রায় রোজই সন্ধ্যেবেলা খেতে আসে সানি পার্কে।

নিবারণ সোম সিগার মুখে ড্রইং রুমের সোফায় বসে বিলাতী পত্রিকার পাতা ওল্টান। নির্ম্মলকে দেখলেই শুক্‌নো হেসে আলাপ করেন, কি খবর নির্ম্মল, কাজকর্ম্ম কেমন চলছে?

নির্ম্মলও অল্প হাসে, ভালই।

—কাল একটা পার্টিতে তোমাদের কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা হল, অড্‌লিংটনও আমার বিশেষ বন্ধু কিনা—

—জানি, আমার চাকরির সময় উনিই ইণ্টারভিউ নিয়েছিলেন। রেফারেন্সে আপনার নাম দেখে—

নিবারণ সোম থামিয়ে দিয়ে বলেন, আমাকেও একবার তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল। লোকটা ভাল। একটু থেমে, আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমার ফ্ল্যাটটাতো বেশ ভালই শুনলাম—

—হ্যাঁ, রঞ্জিত সেদিন গিয়েছিল, ওর বেশ পছন্দ হয়েছে।

রঞ্জিত নির্ম্মলের মাসতুতো ভাই। গাড়ী করে সেদিন বেড়াতে বেরিয়ে ওর ফ্ল্যাটটা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, নির্ম্মলদা আর তোমার কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। এমন চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়েছ এবার বিয়েটা করে ফেল।

—আমার বিয়ের জন্য তোর এত মাথা ব্যথা কেন? নির্ম্মল হেসে ফেলে।

—মাসীমা তো রোজ লম্বা চিঠি লেখেন তোমার জন্যে মেয়ে পছন্দ করতে।

—পছন্দ করেছিস্ কাউকে?

—কতই তো রয়েছে। কিসে তোমার পছন্দ বল। তুমি তো আর আমাদের মত প্রেম করে বিয়ে করবে না। অতএব যদি নাম শুনে পছন্দ কর তাহলে বলতে হবে দু'অক্ষরে না তিন অক্ষরে না চার অক্ষরে। যে রকম ধর—রিণা, লিনা, মিত্রা, চন্দনা, অতসী, মধুছন্দা, কৃষ্ণলেখা—

নির্ম্মল থামিয়ে দিয়ে বলে, তুই কি নামতা পড়ছিস্?

—আর যদি ডিগ্রি চাও তাহলে বল্‌তে হবে শুধু গ্রাজুয়েট না স্কলার

—তোর হাতে বুঝি সবরকমের মেয়ে আছে?

—নিশ্চয়, নাচিয়ে বাজিয়ে গাইয়ে, এমনকি ফিলম্‌ষ্টার পর্য্যন্ত।

নির্ম্মল চোখ বড় বড় করে বলে, তবে আর কি, একটা প্রজাপতি অফিস খুলে বোস।

রঞ্জিত কি-জবাব দিতে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময় অরুণা এসে ঘরে ঢোকে। রঞ্জিতের দিকে একদৃষ্টে তাকিযে থেকে নির্ম্মলকে জিজ্ঞেস করে, এ কে নির্ম্মলদা ?

নির্ম্মল জবাব দেয়, আমার মাসতুতো ভাই—

অরুণা আবার জিজ্ঞেস করে—বিয়ে হযেছে ?

—না।

—এমন সুন্দর চেহারা, কেন বিযে করেনি ?

রঞ্জিত একটাও কথা বলতে পারে না। তার আশ্চর্য্য লাগে। অরুণা তার কাছে এগিয়ে যায়। বলে, আপনার ভাই তো একেবারে ছেলেমানুষ নির্ম্মলদা। এই বয়সে লোকে আমায় খুব সুন্দরী বল্‌তো। মাথায় ঢল্‌কো করে খোঁপা বেঁধে নিলাম্বরী শাড়ী পরে যখন বেরতাম পাড়ার এয়োস্ত্রীরা তাদের বর সাম্‌লাতো। মিথ্যে বলছি না, মাকে জিজ্ঞেস কর।

আরো কিছুক্ষণ আবোল তাবোল বকে অরুণা চলে যায়। নির্ম্মল বোঝাবার চেষ্টা করে, অরুণার মাথা খারাপ। যা তা বলে, ওর কথা কানে তুলিস্‌ না।

মুচকি হেসে রঞ্জিত বলেছিল, বেশ ফ্ল্যাট খুঁজে বার করেছ নির্ম্মলদা, এমন সুন্দরী পাগলী, প্রতিবেশিনী। নির্ম্মল তাকে থামিয়ে দিয়ে অরুণার দুঃখের কথা জানায়। বলে এর চেযে বড় ট্রাজেডি কি আর হতে পারে ? আমি তো মেয়েটাকে যত দেখি মনে হয় এ বোধহয় আর ভালো হবে না।

নিবারণ সোম ছেলের কাছে শুধু ফ্ল্যাটের বিষয় শোনেন নি অরুণার

পাগলামীর কথাও শুনেছিলেন। কৌতূহল প্রকাশ করেন, মেয়েটার কি জন্ম থেকেই মাথার দোষ?

—না আগে তো শুনেছি ভালোই ছিল। বছর কয়েক থেকে—

খুব বেশী ভায়ালেন্ট হয়? হাত পা ছোঁড়ে কি চেঁচামিচি করে?

—আমি ঠিক জানি না।

নিবারণ সোম চুরুট ধরান, শক্ ট্রীট্‌মেণ্ট হয়েছে কিনা জানো?

— বোধ হয় হয়নি, ওদের অবস্থাও নেই।

—যদি দরকার হয় আমায় বোলো, আমার এক বিশেষ বন্ধু এই অসুখের নামজাদা ডাক্তার। হয়তো বিনে পয়সায় চিকিৎসা করতে পারে।

—নিশ্চয় বলবো। নির্ম্মল মনে মনে ভাবে মণীশবাবু শুনলে খুসী হবেন। উনি তো চেষ্টার ক্রটি করছেন না, এর উপর শক্ থেরাপী করলে হয় তো অরুণা সত্যই ভালো হয়ে উঠবে।

যেদিন সন্ধ্যেবেলা কোন পার্টি থাকে না মাসীমা ড্রইং রুমে বসে কাঠি দিয়ে উল বোনেন। সযত্নে পাতা কাটা চুলের পেছন দিকে তিন কোণা চ্যাপ্টা খোঁপা বাঁধা। বোনার সময় চশমা দরকার হলেও কথা বলার আগে নামিয়ে নেন। নির্ম্মলের সঙ্গে একান্তে কথা বলার উদ্দেশ্যেই রোজকার মত নীচের ড্রইং রুমে না বসে আজ ওপরের বারান্দাতেই বসেন।

নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার মাসীমা, ওপরে নিয়ে এলে যে!

সে কথার উত্তর না দিয়ে মাসীমা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, অনীতা সিন্‌হা কি ধরনের মেয়ে?

—কোন অনীতা, রঞ্জিতের বান্ধবী?

—হ্যাঁ।

—কেন বলত?

মাসীমা নীচু গলায় বলেন, জান তো খোকার সঙ্গে ওর খুব ভাব, ধর যদি খোকা ওকে বিয়ে করতে চায়।

—রঞ্জিত কি কিছু বলেছে ?

মাসীমা সে কথার উত্তর দেন না, নিজের মনেই বলেন, কতদিন ওঁকে বারণ করেছি এভাবে মেয়েদের সাথে মেলামেশা করতে দেওয়া উচিত নয়। একটা কথাও কি কানে তোলেন। বরাবর হেসে বলেছেন, তিন চার জন মেয়ে বন্ধু থাকা খুব ভাল, ইংরেজীতে যাকে বলে হেল্‌দি, তাতে কারো উপর মন বসতে পায় না, যার জন্যে সারা জীবন প্যান প্যান করবে।

নির্ম্মল বোঝে অনীতা আর রঞ্জিতের বিষয়ে নিশ্চয় কোন কথা উঠেছে, কিন্তু মাসীমা খুলে বলছেন না।

জিজ্ঞেস করে, কথাটা কে পাড়ল ?

—কথা আর কে পাড়বে ; যখনই দেখলাম আর সব বন্ধুরা বিদায় নিয়েছে, খোকা শুধু অনীতার সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায়, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে ?

—আশ্চর্য্য, রঞ্জিত আমায় কিছুই বলে নি তো।

—মাসীমা অনেক কথাই বলে গেলেন। ছেলেকে মানুষ করতে তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন, বাবা আবদার দেওয়ায় রঞ্জিত একেবারেই সেভাবে মানুস হয়নি। এখন যদি বৌটিও তাঁর পছন্দ মত না আসে তাহলে আর তাঁর দুঃখের অবধি থাকবে না। নির্ম্মলকে সবিশেষ অনুরোধ করে বলেন, ভাল করে অনীতার খোঁজ খবর নিও। কি জানি ওর বাড়ীর কাউকেই তো আমরা জানি না। তাছাড়া খোকার মনের ইচ্ছেটাও তুমি হয়ত ঠিক জানতে পারবে।

নির্ম্মল ভরসা দিয়ে বলে, তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছো মাসীমা, খোকাকে আম যতদূর জানি ও এমন একটা কিছু করে বসবে না যাতে তোমরা অসুখী হও।

বিকেলের দিকে হঠাৎ বৃষ্টি এল।

নির্ম্মল ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে, দৌড়ে বাড়ীর কাছাকাছি আসে। একেবারে মোড়ের মাথায় মণীশবাবুদের ফ্ল্যাট, সেইখানেই ঢুকে পড়ে।

বাইরের ড্রইংরুমে মণীশবাবুর স্ত্রী শোভনা বৌদি সোফায় বসে সার্টের বোতাম লাগাচ্ছিলেন, নির্ম্মলকে দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করেন, ঝোড়ো কাকের মত কোথা থেকে ?

নির্ম্মল কোট খুলে চেয়ারের পেছনে টাঙ্গিয়ে রাখতে রাখতে বলে, আর বলবেন না, বৃষ্টির কি কোন আক্কেল আছে। আজকে ধোপ দুরস্ত স্যুট বার করেছি কেউ বিশ্বাস করবে ? জলে ভিজে ন্যাতা হয়ে গেল।

বৌদি হাসেন, বলেন বিয়ে থাওয়া করনি, তোমার আবার ভাবনা কি ?

—করিনি বলে যে করবো না, তার কোন মানে নেই।

—আমি শুনেছি সব, আমাকে না বল্লে কি হবে।

নির্ম্মল হেসে জিজ্ঞেস করে, কি শুনেছেন ?

বৌদি দুষ্টুমী করে হেসে বলেন, বেশ মিষ্টি দেখতে মেয়েটি, কি নাম গো ?

—অরুণা ছবিটা এনে দেখিয়েছে বুঝি ?

—আমাকে দেখাওনি কেন ? পাছে ভাঙচি দিই বলে ?

নির্ম্মল কথাটা এড়িয়ে যায়, এই তো মা পাঠিয়েছেন, আমিই এখনও ভালো করে দেখিনি।

বৌদি হেসে গড়িয়ে পড়েন, তাই বইকি, ছবি আসতেই ছেলের মাথা এমন ঘুরে গেল আর এই পচা বৌদিকে মনেই পড়ে না। না জানি বিয়ে হলে কি হবে।

নির্ম্মল সহজ গলায় বলে, আপনি আমায় চিনতে পারেন নি বৌদি।

—তার মানে ?

—ছবি, মেয়ে, কিছুই আমি দেখব না। মা যাঁকে পছন্দ করবেন সেই হবে তাঁর পুত্রবধূ।

—আজকালকার ছেলেদের মুখে তো এরকম কথা শুনি না। তবে সত্যিই যদি মায়ের ওপর এই বিশ্বাস রেখেই জীবনে চলতে পারো কখনও ঠক্‌বে না।

এই সদাহাস্যময়ী বৌদিটিকে নির্ম্মলের ভালো লাগে। সাতে পাঁচে থাকেন না, সব সময় নিজের কর্ত্তব্য করে যান। নির্ম্মল শ্রদ্ধাভরে বলে, আপনার কথা শুনলে আমার কত সময় মায়ের কথা মনে পড়ে।

বৌদির চোখ ছল ছল করে, হেসে বলেন, আমরা দুজনেই সেকেলে ধরনের বলে বুঝি ?

—না বৌদি, আপনাদের দুজনের মধ্যেই পেয়েছি অনেক উন্নত, অনেক বড় মনের পরিচয়। যা সাধারণের মধ্যে পাই না।

বৌদি চুপ করে নিজের মনেই কি যেন ভেবে বলেন, আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ ঠাকুরপো। কতটুকুই বা জানি। ভাল মন্দ যা কিছু শিখেছি তা আমার বাবার কাছে, কত কষ্টে যে আমাদের মানুষ করেছেন তা শুধু আমরাই জানি।

নির্ম্মল হঠাৎ হেসে জিজ্ঞেস করে, কতদিন আপনাদের বিয়ে হয়েছে বৌদি ?

বৌদি ম্লান হাসেন, তখন আমার বয়স তের বছর। আজকালকার মেয়েদের মত কথায় কথায় তর্ক করতে তো শিখিনি ভাই, তাই তখন থেকেই স্বামীকে দেবতা বলেই জেনেছি। বিশ্বাস কর এতে আমি খুব সুখে আছি।

—তা কি আমি জানি না ?

—আজ পর্য্যন্ত কোনদিন স্বামীর নিজস্ব ব্যাপারে আমি মাথা গলাই নি। আজও জানিনা উনি কি রোজগার করেন, কত জায়গায় পড়ান, প্রত্যেক মাসে খরচের জন্য যে টাকা দেন ঐতেই আমি খুসী।

—আপনাদের জোড় মিলেছে বড় সুন্দর—যেমনি মণীশবাবু আত্ম-ভোলা মানুষ, তেমনি আপনি।

বৌদি কথা শেষ করতে না দিয়েই বলেন, তুমি ঠিক ধরেছ ঠাকুরপো, ওঁর মনটা বড় নরম। গরাব দুঃখীর ওপর কত মায়া, এই দেখনা অরুণা বেচারাকে উনি কত স্নেহ করেন, ওকে সরাবার কি চেষ্টা।

কথা হয়তো চল্‌তো, মণীশবাবু এসে পড়ায় তা থেমে যায়। অন্যমনস্ক ভাবে ঘরে ঢুকে হাতের বই-পত্রগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখেন.।

নির্ম্মল নিজে থেকেই সাড়া দিয়ে বলে, এত দেরি হল যে ফিরতে?

মণীশবাবু নির্ম্মলকে দেখে খুসী হন, এই যে নির্ম্মল তুমি রয়েছ! ঠিক যা বলেছিলাম তাই। এই দেখ এই বইটায় লিখেছে যদি কেউ শক্ পেয়ে পাগল হযে যায় আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার পাগলামী সেরে যেতে পারে?

মণীশবাবু চুপ করে চেয়ারে বসে পড়েন। স্ত্রীকে বলেন, আমাদের একটু চা খাওযাও না—

বৌদি বোধ হয় চা আনতে উঠেই দাঁড়িয়েছিলেন, বলে গেলেন, তোমরা গল্প কর নিম্মল আমি এখুনি আসছি।

মণীশবাবুকে একা পেয়ে নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, অরুণার কি বিয়ে হয়েছিল?

মণীশবাবু বিস্মিত হন, এ কথা কেন বলছ?

—ও আমাকে বলে ওর বর খুঁজে দিতে।

—তোমাকেও বলেছে; মণীশবাবু কি যেন চিন্তা করেন, আমাকেও মাঝে মাঝে বলে, এর জন্যে দায়ী কারা জান?

—কারা?

—ওর বাপ মা।

—এ কি বলছেন?

—আমার বিশ্বাস ছোটবেলায় অরুণাকে মিশতে দেওয়া হয়েছিল ওর বয়সী ছেলেদের সঙ্গে। সেই সময ও হয়ত কাউকে ভালবাসে। অরুণার রূপ ছিল, সে ছেলেটির পক্ষেও ওকে ভালবাসা অস্বাভাবিক নয। মনে কর তারা বিয়ের স্বপ্ন দেখ্‌ল, কিন্তু কোন কারণে তা হোল না। এই শক্‌ই কি যথেষ্ট নয অরুণাকে পাগল করে দেওয়ার পক্ষে ?

--একথা কি আপনি ওদের কাছে শুনেছেন ?

—না, এ আমার অনুমান। তবে আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই অরুণার কাছ থেকে সব কথা জানতে পারব ?

নির্ম্মল ব্যথিত হয, সত্যিই বড় দুঃখের কথা। ওকে কি সারানো যাবে না ?

মণীশবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দেন, চেষ্টার তো ত্রুটি কবছি না।

—আমার মেসোমশাই বলছিলেন ওঁর এক ডাক্তার বন্ধু আছেন, যিনি শক্‌ট্রিটমেণ্ট করেন। যদি চান ওঁকে একবার দেখাতে পারি। মণীশবাবু বাধা দিযে ওঠেন, শক্ দিয়ে একে ভাল করা যাবে না। সাইকো অ্যানালিসিস করে যদি হয়।

নির্ম্মল আহত স্বরে বলে, সে আপনি ভাল বুঝবেন।

বৌদি চা নিয়ে আসায় এ-প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়।

নির্ম্মল নিজের ঘরে ফিরতেই বেয়ারা জানাল ঘোষ সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

নিজে এসেছিলেন বুঝি ?

—হ্যাঁ আধঘণ্টা আগে।

—বলে এস, আমি একটু বাদেই যাচ্ছি।

রাতুল ঘোষ এই বিরাট ম্যানশনের এক কোণায় দু'খানি কামরা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে, দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ অনেক বেশী। মাথায় টাক, রোদে পোড়া তামাটে রং, জোরে হাসলে ছোট ছোট চোখদুটো জ্বল-জ্বল করে ওঠে। মুখের হাঁ বেশ বড়, লোকে ঠাট্টা করে বলে রাতুল

ঘোষের কান এঁটো করা হাসি। একলা মানুষ, নির্ম্মল ছাড়া এ ম্যানসনের কারুর সঙ্গেই বিশেষ আলাপ নেই। যদিও তিনি ঐ ফ্লাটেই আছেন প্রায় দু'বছর। নির্ম্মলও প্রথম প্রথম এসে রাতুল ঘোষের সম্বন্ধে নানারকম কথা শুনেছে। মণীশবাবু বলতেন, —এক কথায় যদি ওর পরিচয় চাও, ওর নাম হল সেলফিশ জায়াণ্ট। যেমনি জায়াণ্টের মত চেহারা, স্বভাবটিও তেমনি। নিজেরটুকু ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

নির্ম্মল জিজ্ঞেস করেছিল, কি করেন ভদ্রলোক? দু'পয়সা আছে বলেই তো মনে হয়।

আছে তো নিশ্চয়। যতদুর শুনেছি মিলে ষ্টোর সাপ্লাই-এর ব্যবসা করেন। ওখানে শুধু ঘুষ দিয়েই পয়সা, হয়তো, মালই পাঠালেন না, বিল ঠিক পাশ হয়ে গেল।

শুধু মণীশবাবু নয়, সকলেরই এক কথা। অরুণা বলেছিল, খবর্দ্দার ঐ লোকটার সঙ্গে মিশবেন না নির্ম্মলদা! ভীষণ অসভ্য—

—কি রকম?

—আমাকে দেখলেই চোখ দিয়ে গিলে খায়।

—নির্ম্মল হেসে ফেলে, অরুণা জোর দিয়ে বলে সত্যি বলছি নির্ম্মলদা, রাতুল ঘোষ হচ্ছে একটা জানোয়ার।

নির্ম্মলও এদের কথা শুনে বরাবরই রাতুল ঘোষকে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু একদিন হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল, পার্ক ষ্ট্রীটের বিলাতী নিলাম ঘরে। নির্ম্মল গিয়েছিল দু'একটা সৌখীন আসবাবপত্রের খোঁজে যা অনেক সময় এই সব নিলাম ঘরে পাওয়া যায়। আজকে অবশ্য নির্ম্মলের পছন্দ সই বিশেষ কিছু ছিল না। শুধু একটা মেহগনি কাঠের ছোট্ট বুক্ কেস্। যার জন্যে সে পঞ্চাশটাকা পর্য্যন্ত ডাকতে রাজী ছিল। কিন্তু ডাকের সময় দেখা গেল আর একজনের নজর ঐ বুক্ কেসটারই উপর। নির্ম্মল পঞ্চাশ পর্য্যন্ত ডেকে থামে, অপর পক্ষ পঞ্চান্নতে ওঠায়

নির্ম্মল ভালো করে তাকিয়ে দেখে সে ভদ্রলোক আর কেউ নয় রাতুল ঘোষ।

হেসে রাতুল ঘোষ নির্ম্মলের কাছে এগিয়ে আসে, অত্যন্ত দুঃখিত। তবে ঐ জিনিষটা আমার বিশেষ দরকার।

একথায় উত্তর দেবার কিছু ছিল না। নির্ম্মল শুকনো একটু হাসে। রাতুল ঘোষ নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, এখান থেকে বাড়ী ফিরবেন তো ?

হ্যাঁ।

—চলুন, একসঙ্গে ফেরা যাক।

—বুক-কেসটা নেবেন না ?

—দশ টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়েছি, পরে নিয়ে যাব।

—অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্ম্মল রাতুল ঘোষের সঙ্গে একগাড়ীতে ফেরে।

—আপনি এখানে ক'দ্দিন ফ্ল্যাট নিয়েছেন ?

নির্ম্মল উত্তর দেয়, এই তো ক'মাস।

—আমি আবার বিশেষ কাউকে চিনি না, নিজের মনেই থাকি। আসবেন না একদিন আমার ফ্ল্যাটে।

—আসব।

—বাড়ীর মেয়েরা এলেও খুব খুসী হব। যদিও তাঁদের পৃথকভাবে নিমন্ত্রণ করার অধিকার আমার নেই কারণ—

নির্ম্মল পদপূরণ করে, আপনি ব্যাচেলার।

—একরকম তাই, বলেই রাতুল ঘোষ হা হা করে হাসে, সেই কান এঁটো করা হাসি। আবার জিজ্ঞেস করে, আপনি নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছেন, তাই না ?

নির্ম্মল কোন উত্তর দেয় না। রাতুল ঘোষ বলে যায়, আমি কত বড় অসৎচরিত্র, কতখানি স্বার্থপর, কি ভীষণ মাতাল ; সব শুনেছেন নিশ্চয় ?

নির্ম্মল লজ্জিতভাবে হাসে।

—লজ্জা পাবার কিছু নেই, বুঝলেন না, কথায় বলে যা রটে তার কিছু বটে।

বেশ কিছুক্ষণ আর কথা হয় না। রাতুল ঘোষ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনি নিশ্চয় আমার ওপর রাগ করেছেন?

—কেন বলুন তো?

—রেষারেষি করে ঐ জিনিষটা কিনে নিলাম।

—তাতে কি হয়েছে। হয়ত আপনার দরকার আমার চেয়ে বেশী।

—ঠিক তা নয়, ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কি যেন ভেবে নিয়ে বলে, ও জিনিষটা আমারই।

নির্ম্মল বিস্মিত হয়, তার মানে?

আপদ বিদায় করব বলে বিক্রী করতে দিয়েছিলাম, তারপর ডাকা-ডাকির সময় হঠাৎ মনে হোল ওটা বিক্রী করব না। তাই ইচ্ছে করে বেশী দাম বলে আটকে রাখলাম।

আর কথা হয় না, গাড়ী এসে বাড়ীতে থামে। রাতুল ঘোষ হাত তুলে নমস্কার করে বলে, নিশ্চয় আসবেন একদিন, তা না হলে দুঃখ পাব।

সেই থেকে রাতুল ঘোষের সঙ্গে পরিচয়। ক'দিন বাদে সন্ধ্যেবেলা নির্ম্মল গিয়েছিল রাতুল ঘোষের ফ্ল্যাটে। দু'খানি ঘরই বেশ সাজান। পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে রাতুল ঘোষ সোফায় বসে বোধহয় অফি-সেরই কাজ করছিল। নির্ম্মলকে দেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আসুন নির্ম্মলবাবু, সেদিন থেকেই আশা করছিলাম যে কোন দিন সন্ধ্যেবেলা আপনি আসবেন।

নির্ম্মল হাসে, কাজের চাপে সময় হয়ে ওঠেনি।

—এ জায়গাটা কিরকম লাগছে?

—মন্দ নয়। আমার পাশের ফ্ল্যাটেই মণীশবাবুরা আছেন, এদিকে অরুণারা আর নীচে থাকেন এক পাঞ্জাবী পরিবার, মিষ্টার সায়গল ও তাঁর স্ত্রী।

রাতুল ঘোষ থামিয়ে দেয়, আপনি লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে খুব ভালবাসেন না?

—হ্যাঁ। এই গল্পগুজব করা। এ ছাড়া জানেন বোধ হয় অরুণা মেয়েটির মাথায় দোষ আছে, ওকে নিয়ে সকলেরই দুর্ভাবনা। কি করে যে সারানো যায়—

রাতুল ঘোষ আবার থামিয়ে দেয, আপনার স্ত্রী কোথায়?

—আমি এখনও বিয়ে করিনি।

—তাই বলুন। নিজের সংসারের ভাবনা নেই বলেই এতজনের কথা ভাবছেন। ভদ্রলোক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, যাক্‌গে সে কথা, কি পান করবেন, হুইস্কি?

—আমি কিছুই খাই না—

—খেতে আপত্তি নেই তো?

নির্ম্মল কুণ্ঠিত হয়, আমায় মাপ করবেন।

নিম্মলকে কিছুতেই রাজী করাতে না পেরে রাতুল ঘোষ তার হাতে লেমন স্কোয়াশের গেলাস ধরিয়ে দিযে নিজে হুইস্কি নিয়ে বসে। হেসে বলে কি হারাচ্ছেন আপনি তা জানেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতুল ঘোষ নেশায় রঙীন হয়ে ওঠে। হুইস্কির বোতলটা উঁচু করে হাতে ধরে বলে, নির্ম্মলবাবু এ আমার অকৃত্রিম বন্ধু, আমি ওকে ত্যাগ না করলে ও আমাকে কোনদিন ত্যাগ করবে না।

নির্ম্মল সায় দেয়, তা সত্যি, তবে এ বন্ধুটির সঙ্গ খুব ভাল নয়।

—মানুষ-বন্ধুদের চেয়ে ঢের ভাল। এরা ধার চায় না, সুবিধে পেলে ঠকায় না। ফাঁকি দিয়ে পালায় না—

—আপনার বোতলের মত সতি কার মানুষ-বন্ধুও তো হয়।

—হয় নাকি? রাতুল ঘোষের গলায় অবিশ্বাস। একটু পরে জিজ্ঞেস করে, আপনি বিয়ে করেন নি বল্লেন?

—না, করিনি।

—খুব ভাল, খবর্দ্দার করবেন না।

—কেন বলুন তো?

ঘেন্নায় রাতুল ঘোষের নাক কুঁচ্‌কে ওঠে, মেয়েদের মত স্বার্থপর আর সুবিধেবাদী দুনিয়ায় কেউ নেই। মুখে মধু আর পেটে শয়তানি। কখনও প্রেমে পড়েছেন?

—এখনও. নয়।

—তাহলেই টের পাবেন ও জীবটি কি। আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে·সব কিছু বার করে নিয়ে কলা দেখাবে। ঐ ওদের ব্যবসা।

নির্ম্মল বোঝে রাতুল ঘোষের ব্যথার জায়গা কোথায়। নিশ্চয় কাউকে ভালবেসে পায়নি। সে কথা ভুলতেই মদের বোতল আর এই উচ্ছ্বাস।

—নির্ম্মলবাবু, শরৎ চাটুজ্যের বই পড়ে একেবারে ভুল ধারণা হয়েছিল, এদেশের পথে ঘাটে বুঝি মা বোন ছড়ান আছে। রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী. সবাই খুব খাঁটি। ও সব ভূয়ো, নভেল নাটকে চলে।

সেদিন এই পর্য্যন্তই কথা হয়েছিল তবে পরে একদিন সুযোগ পেয়ে নির্ম্মল জিজ্ঞেস করেছিল, রাতুলবাবু আপনি বুঝি কাউকে ভাল-বেসেছিলেন?

রাতুল ঘোষ বিস্মিত হয়, কেন বলুন তো?

—এমনি জিজ্ঞেস করছি?

—হ্যাঁ, ভালোবেসেছিলাম। রাতুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে, প্রাণের চেয়েও বেশী। আজ বুঝতে পারি ভুল করেছিলাম। তখন বুঝিনি। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী।

রাতুল ঘোষ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মেয়েটির রূপ বর্ণনা করে। এক পেগ

সোডা না মেশানো হুইস্কি গিলে ফেলে জিজ্ঞেস করে, আপনি কবিতা পড়েন ?

—কিছু কিছু পড়েছি।

—আমি আগে কখনও পড়িনি তবে এখন পড়ি। জন ডনের নাম শুনেছেন ?

নির্ম্মল ভেবে নিয়ে বলে, নামটা শোনা মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কোন বইএ যেন—

—ওর একটি কবিতা বড় সুন্দর, 'Song' যাতে বলেছেন হাজার রকম অসম্ভব জিনিষ হযত সম্ভব হতে পারে, হাজাবো অদ্ভুত ঘটনা হয়ত চোখে পড়তে পারে কিন্তু কোন রূপসী নারী সতীব মত জীবন কাটাচ্ছে এ চোখে পড়বে না।

All strange wonders that befall thee
And sweare
No where
Lives a woman true and fair.

কবিতা শুনিয়ে রাতুল ঘোষ দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, আমি এতক্ষণ যা বলছিলাম, কবি ঠিক তাই বলেছেন কিনা। সুন্দরী মেয়ে অসতী না হয়ে পারে না।

নির্ম্মল মুখে একথার প্রতিবাদ না করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। রাতুল ঘোষের কথা জড়িয়ে আসে। ঘরের কোণে রাখা বইএর সেল্‌ফ্‌টা দেখিয়ে বলে, ঐ যেটা আপনি কিনতে চাইছিলেন সেদিন, বেয়ারা দিয়ে আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিই।

নির্ম্মল ব্যস্ত হয়ে বলে, না না সেকি।

রাতুল ঘোষ উঠে দাঁড়ায়, পা তার টল্‌ছে। নির্ম্মলের হাত দুটো ধরে মিনতি ভরা গলায় বলে, ওটাকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যান। রাত্রি হলেই ঐ সেলফটাকে কি বিশ্রী লাগে—

—সে পরে হবে, আপনি এখন বরং বিশ্রাম করুন।

রাতুল ঘোষ আবার সোফায় বসে পড়ে, তাহলে ওটার ওপর কিছু চাপা দিয়ে দিন যাতে না আর চোখে পড়ে।

নির্ম্মল সেল্ফ্‌টা ঢেকে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রাতুল ঘোষ তখনও নেশার ঝোঁকে বিড় বিড় করছে।

যদিও নির্ম্মল মাসীমাকে একরকম কথা দিয়ে এসেছিল, অনীতা সিনহার বাড়ীর খোঁজ খবর সে নেবে, কিন্তু নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রায় এক মাসের মধ্যে তা হয়ে ওঠে না। অনীতার সঙ্গে মৌখিক পরিচয় তার অনেক দিনের। রঞ্জিতের বন্ধুমহলে তাকে দেখেছে। হাত তুলে নমস্কার করে দু'চারটে কথাও বলেছে, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। বিশেষ করে অনীতার সম্বন্ধে নির্ম্মলের কোন কৌতূহলই ছিল না। অনীতা সিন্‌হা সেই ধরনের মেয়ে যাকে দেখলেই মনে হয় বড় বেশী নাক তোলা। যারা মেয়ে-বন্ধু করে না, পুরুষদের সঙ্গে গল্প করতেই যেন ভালবাসে। নির্ম্মল কতদিন লক্ষ্য করেছে রঞ্জিতদের বাড়ী পার্টিতে এসেও অনীতা এক কোণে বসে অতি আধুনিক ইংরাজী কবির কবিতা পড়ে। নির্ম্মল কথার ছলে একদিন কাউকে যেন বলেছিল, অনীতা সিন্‌হা একটা স্থাকার তাজমহল। সব সময় ওর চেষ্টা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার।

রঞ্জিত যে কি করে তার বান্ধবীদের সবাইকে সরিয়ে অনীতা সিন্‌হাকে কাছে টেনে নিল তা সহজ বুদ্ধিতে নির্ম্মল বুঝতে পারে না। রঞ্জিত সুপুরুষ তো বটেই তার উপর কথাবার্ত্তার ধরন, চাল-চলন সহজেই চোখে পড়ে। বিলিতী স্কুলে লেখা পড়ার সুবিধেটুকু সে পুরো মাত্রাতেই পেয়েছে। পরিষ্কার এ্যাক্‌সেণ্টে সে ইংরিজী কথা বলে। পুরো মাত্রায় কেতা দুরস্ত। ইংরাজী কোম্পানীতে বাবার

সুপারিশে এ্যাসিসটেণ্ট-এর পদ পেয়েছে। ভাল মাইনে, গাড়ী, তিন বছর অন্তর বিলেত যাওয়ার ছ'মাসের ছুটিও পায়। অতএব রঞ্জিতের ওপর নজর ছিল শুধু তার বান্ধবীদের নয়, তাদের মা'দেরও। নির্ম্মল ভেবেছিল রঞ্জিতকে পাবার প্রতিযোগিতায় লক্ষ্যভেদ করবে মার্জারী বোস। আহা মরি—সুন্দরী না হলেও নিজেকে রঙীন করে তোলার ক্ষমতা ছিল তার যথেষ্ট। মার্জারী বোস লরেটোতে পড়া মেয়ে, রঞ্জিতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইংরেজীতে তর্ক করতে পারত সেই-ই। রঞ্জিতের মত সেও বাপমার একমাত্র সন্তান। পদমর্য্যাদায় সমান না হলেও দু' বাড়ীর আর্থিক অবস্থা খুব উনিশ বিশ নয়। তার ওপর মিসেস বোসের মত মার্জিত রুচি সম্পন্না মহিলা বিরল। রঞ্জিতের বাড়ীর সকলের সঙ্গেই তার আন্তরিকতা। নিবারণ সোমের সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেন আজকালকার সমাজের নানারকম সমস্যা নিয়ে।

নিবারণ সোম বলতেন, আমার স্ত্রী কিন্তু আপনার মত দেশের সমস্যাগুলো এত তলিয়ে দেখতে চান না। উনি সবের জন্যেই ঈশ্বরের দোহাই দেন।

মিসেস বোস হেসে উত্তর দেন, আমার সঙ্গে ঐখানেই যে পার্থক্য মিঃ সোম, ভগবানে বিশ্বাস আমার মোটেই নেই। আপনি কি বলেন? নিবারণ সোম চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ইতস্তত করে বলেন, কি জানি, এখনও তো ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু তাই বলে যে ওঁর অস্তিত্ব একেবারে নেই সে কথাও জোর করে বলতে পারি না।

নির্ম্মলের মাসীমা এই জন্যেই খানিকটা দূরে রাখতে চেয়েছিলেন মার্জারী আর তার মাকে। ধর্ম্মে যাদের এতটুকু বিশ্বাস নেই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে আপত্তি না থাকলেও আত্মীয় হিসেবে বাড়ীতে আনতে রাজী ছিলেন না মোটেই। কিন্তু অনীতা সিন্‌হার সঙ্গে তুলনা করলে মার্জারী বোসের আচার ব্যবহার অনেক ভাল সে কথা তিনি

অকপটেই স্বীকার করেন। অনীতার বাড়ীর অবস্থা যে ভাল নয়, সে তার সাজ পোষাক, ট্রামে বাসে ঘোরা সবের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেই জন্তেই বোধ হয় বাড়ীর কথা নিয়ে কোনরকম আলোচনাই অনীতা করে না। মাসীমা একদিন কথার ছলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অনীতা, বালীগঞ্জের কোন জায়গায় তোমাদের বাড়ী ?

অনীতা উত্তর দিয়েছিল, ষ্টেশনের কাছে।

—ঠিকানাটা কি ? শুধু ষ্টেশন বল্লেই তো আর বাড়ী চেনা যাবে না।

—কেন মাসীমা, আমাদের বাড়ী যাবেন নাকি ? কিন্তু রাস্তাটা অত্যন্ত সরু, আপনাদের বুইক গাড়ী তো ঢুকতেই পারবে না।

অনীতার কথার ধরনে মাসীমা বিরক্ত হন, গাড়ী ছাড়া বুঝি আমরা এক পাও চলতে পারি না।

অনীতা হেসে বলে আপনি রাগ করছেন কেন ? কখনও তো কোথাও হেঁটে যেতে দেখিনি, তাই বল্লাম। একটু থেমে বলেছিল, তাহলে বরং রঞ্জিতের সঙ্গে আসবেন, ওতো প্রায়ই আসে।

কথা শুনে মাসীমা শঙ্কিত হন। তাঁর ছেলের স্বভাব ভাল করেই জানেন। কাউকে বিশেষ ভাবে মনে না ধরলে কারুর বাড়ী ঘন ঘন যাবার পাত্র রঞ্জিত মোটেই নয়। সেই জন্তেই নির্ম্মলকে বলেছিলেন রঞ্জিতের মনের ইচ্ছাটা ভাল করে জানতে।

ক'দিনের মধ্যেই নির্ম্মল সুযোগ পেল রঞ্জিতের সঙ্গে একলা বসে কথা বলার। সেদিন মাসীমাদের বাইরে খাওয়ার নেমন্তন্ন। নির্ম্মল সন্ধ্যের পর সানি পার্কে এসে দেখে বাড়ীতে কেউ নেই। বেয়ারা এসে বলে গেল রঞ্জিত অপেক্ষা করতে বলে গেছে, সে আসবে ন'টার মধ্যে। নির্ম্মল লনে গিয়ে বেতের চেয়ারে বসে।

রঞ্জিত ফিরলো একটু দেরিতে। লজ্জিত হয়ে বলে, বড় দেরি হয়ে গেল নির্ম্মলদা। কি করবো, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। নিশ্চয় তুমি—

নির্ম্মল হাসে, না না, আমি বেশ ছিলাম। খান দুই গল্প পড়লাম এই পত্রিকাটা থেকে—

রঞ্জিত সে কথায় কান দেয় না, আমি দেখেছি, অনীতাদের বাড়ী গেলেই আমার দেরি হয়। এমন আশ্চর্য্য মেয়ে। তুমি চেনো তো ওকে—

—তোদের বাড়ীতেই যা দেখেছি—

—ভালো করে আলাপ হলে তুমি সত্যিই খুসী হবে। এমন একটা কিছু আছে ওর মধ্যে যা তোমার ভাল লাগবেই। নির্ম্মল রঞ্জিতকে কথা বলার সুযোগ দেয়, তোদের আলাপ কত দিনের?

—তা বছর পাঁচেক হ'ল বৈকি। আমরা দু'জনে এক কলেজে পড়তাম। আমি অবশ্য এক ইয়ার সিনিয়ার ছিলাম। অনীতা খুব ভালো গান করতো। আমি ছিলাম তখন সোশ্যাল সেক্রেটারী, তাইতেই আলাপ।

পুরোন দিনের কথা বলতে গিয়ে রঞ্জিতের গলায় আমেজ আসে, অনীতা ছিল একগুঁয়ে ধরনের মেয়ে। নিজের ইচ্ছে না হলে কোন অনুষ্ঠানে সে গাইতো না। বন্ধু-বান্ধব, প্রফেসার কারুর অনুরোধের দাম ছিল না ওর কাছে। আমি জানতাম বলেই নিজের মান খুইয়ে কোন দিন ওকে গান করতে বলিনি। অথচ এই নিয়েই ওর সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠ হ'ল। তখন আমি ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। পুজোর ছুটির আগে কলেজে জলসার আয়োজন করছি। গান করবে কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাই বেশী। দু'একজন বাইরে থেকেও আসবে। অনীতার এ অনুষ্ঠানে গাইবার কথা ছিল না। শো আরম্ভ হবার আধঘণ্টা আগে একটি ছেলে এসে খবর দিল অনীতা সিন্‌হা আমার জন্যে মেয়েদের কমনরুমের সামনে অপেক্ষা করছে। গেলাম দেখা করতে।

আমাকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করলে, কি হলো রঞ্জিত বাবু, এবার আমাকে বাদ দিলেন কেন ? আমার গান বুঝি আর ভাল লাগে না।

—তার মানে ? আশ্চর্য্য হলাম, নোটিশ বোর্ডে এ অনুষ্ঠানে গান করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলাম—

—নোটিশ বোর্ড আমি পড়ি না।

—কেন ?

—ওতে বড় বাজে কথা লেখা থাকে।

—তাছাড়া আপনাকে গাইবার জন্যে শীলা সেন, মুকুল বোস এরাও তো বলেছিল। শুনলাম আপনি না বলেছেন—অনীতা তখনও হেসে বল্লে, খোদ সেক্রেটারী থাকতে তার চ্যালা চামুণ্ডার কথা শুনব কেন ?

লজ্জিত না হয়ে বল্লাম, নিজে লিখিনি পাছে আপনি আমার কথা না রাখেন।

—কেন, আমাকে ভয় কিসের ?

এরপর আর কি উত্তর দেব ? বল্লাম, এখনও তো সময় যায়নি, হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, অনিচ্ছাকৃত অপরাধের ত্রুটি মার্জনা করবেন। চলুন, ওদিকে দেরি হচ্ছে।

আশ্চর্য্য মেয়ে অনীতা—তরল গলায় বল্লে, গান করতে পারি তবে একটা সর্ত্তে।

—কি ?

—প্রথমেই আমাকে গাইতে দিতে হবে।

আপত্তি জানিয়ে বল্লাম, তা কি করে হয়। প্রোগ্রাম ছাপা হয়ে গেছে, প্রথমেই সবিতা বসু গান করবেন। উনি আপনার চেয়ে সিনিয়ার।

অনীতা আর কথাই শুনল না। বল্লে, প্রথমে গাইতে না দিলে আমি আর কোনদিন কলেজের ফাংশানে যোগ দেব না। আগে আমায় বললেন না কেন, সে তো আপনার দোষ।

নিরুপায় হয়ে বললাম চলুন, দেখছি আমি কি করতে পারি।

সবিতা বোসকে বল্‌তেই সে তো রেগে আগুন। অনীতাকে সে আবার তু'চোখে দেখতে পারত না। একটা গোলমালের সৃষ্টি হয় আর কি! কি করব ভেবে না পেয়ে অনীতাকে গিযে বল্লাম, ঝগড়া ঝাঁটি করে তো আর লাভ নেই, চলুন অনুষ্ঠান সুরু করুন।

নির্ভীক অনীতা জিজ্ঞেস করলে, কে আগে গান করছে, আমি তো ?

বল্লাম, হ্যাঁ।

অনীতাকে নিযে ষ্টেজে গিযে দাঁড়ালাম। পর্দ্দা উঠল। কাগজগুলো ঠিক করে নিযে প্রস্তাবনা সুরু করতে মাইকের কাছে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে শুনি অনীতা স্বাগতম জানিযে কথা বলতে সুরু করে দিযেছে। ওযে এত ভাল করে গুছিযে কথা বলতে পাবে তা আগে জানতাম না। সকলকে ধন্যবাদ জানিযে সে অনুষ্ঠানেব উদ্বোধন সঙ্গীতেব ঘোষণা করলে, গান করবেন সবিতা বসু। সত্যিই সেদিন ওর ব্যবহারে খুসী না হয়ে পারিনি। আসন্ন ঝড়ের থেকে যে এবকম ভাবে মুক্তি পাব তা মোটেই আশা করিনি।

অনুষ্ঠানের শেষে অনীতাকে ধন্যবাদ জানিযে বলেছিলাম, আজকের কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে।

অনীতার চোখ তুটো হেসে ওঠে, আমারও মনে থাকবে।

রঞ্জিত এই অবধি বলে থামে।

নির্ম্মল উৎসাহ দেয়, বাঃ বেশ রোমান্টিক তো! তারপর ?

রঞ্জিত হো হো করে হাসে, ওঃ তুমি বুঝি এতক্ষণ আমাকে পাম্প করে কথা বার করছিলে। আর নয়। অনেক রাত হল, খেয়ে নি।

—কিন্তু সত্যিই শুনতে বেশ লাগছিল।

—শুনে কাজ নেই। আমি বরং কাল বিকেলে ওকে তোমার বাড়ী নিয়ে যাব। আলাপ করলে সত্যি খুসী হবে।

পরের দিন ছিল শনিবার। অফিস থেকে ফেরার পথে নির্ম্মল বিলিতী দোকান থেকে পেষ্ট্রি আর চীজ্ ষ্ট্র নিয়ে আসে। ঠিক করেছিল আজ আর বের হবে না, রঞ্জিতদের সঙ্গে গল্প করে সন্ধ্যেবেলা কাটাবে। সপ্তাহে একদিন এই শনিবারই নির্ম্মল বাড়ীতে চিঠি লেখে মা, ভাই, বোন সবাইকে। মা আগের চিঠিতে জানিয়েছিলেন, সম্প্রতি ওর শরীর ভাল যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে জ্বর হয়। চিঠি পেয়ে থেকেই নির্ম্মল চিন্তিত ছিল, যাতে ভাল ডাক্তার দেখানো হয় তারই ব্যবস্থা করার জন্যে প্রত্যেককে পৃথকভাবে সে লেখে। দরকার হলে নির্ম্মল ছুটি নিয়ে বহরমপুর চলে যাবে সে কথাও জানাতে ভোলে না।

চিঠি লেখার সময়ই তার বাড়ীর কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। বিধবা মা কি অসীম ধৈর্য্যে বুক বেঁধে যে তাদের দু'ভাই এক বোনকে মানুষ করেছেন তা ভাবলেই নির্ম্মলের চোখে জল আসে। বাবা যখন মারা যান নির্ম্মলের বয়স তখন চোদ্দ বছর। স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র। ছোটভাই সুবিমল সাত বছরের ছেলে আর খুকীর বয়েস বছর তিনেক হবে! সেদিনের কথা নির্ম্মলের স্পষ্ট মনে আছে। বাবার মৃতদেহ দোতলার ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আত্মীয়-স্বজন, কতজন এসে নির্ম্মলকে সান্তনা দেয়। উচ্ছ্বসিত কান্নায় বুক ফুলে উঠে। সকলের কাছ থেকে পালিয়ে কোণের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে। যদিও বোঝে তাকে শ্মশানে যেতে হবে তবু মনকে সে কিছুতেই শক্ত করতে পারে না। জ্যাঠামশায় পর্য্যন্ত এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে নির্ম্মলের নাম করে ডাকলেন। তবু সে উত্তর দিতে পারেনি। কিন্তু তারপর দরজার বাইরে থেকে ডাকলেন মা নিজে, খোকা দরজা খোল।

এ আদেশ নয়, অনুরোধ নয়, আবেগ বিহীন কণ্ঠস্বর। নির্ম্মল উঠে গিয়ে দরজা খোলে, সামনে মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন যেন পাষাণ প্রতিমা।

—যাও, তৈরী হয়ে নাও, তোমাকে মুখাগ্নি করতে হবে।

নির্ম্মল যন্ত্রচালিতের মত মাথা নীচু করে নেমে আসে। খাট কাঁধে করে পথে এগিয়ে যেতে যেতে বাড়ীর দিকে ফিরে তাকায়। বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একপাশে খুকী আর একপাশে সুবিমল। নির্ম্মলের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

এরপর থেকে নির্ম্মল মার কাছে একটা কথা বার বার শুনেছে, খোকা তোকে মানুষ হতে হবে। সুবিমল আর খুকী যেন তাদের বাপের অভাব বুঝতে না পারে। এই তোর সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য।

নির্ম্মল মার কথা পুরো মাত্রায় রেখেছে। জ্যাঠামশাই-এর কাছে থেকে বহরমপুরে ম্যাট্রিক, আই এ পাশ করে। বিভাগীয় বৃত্তি নিয়ে কলকাতায় এসে হোষ্টেলে থেকে সসম্মানে ইউনিভারসিটির ডিগ্রী নিয়ে বিলিতী তেল কোম্পানীর কাজে ঢুকেছে। সুবিমল আর খুকীর কাছে নির্ম্মল আদর্শ দাদা। বাড়ীতে থাকতে সব সময় তাদের পড়া দেখিয়ে দিয়েছে, সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা সস্নেহে করেছে। দূরে থেকেও দীর্ঘ চিঠি দিয়ে এদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হবার কোন সুযোগ দেয়নি। নির্ম্মল মনে মনে ভাবে, সেদিনের ফ্রক পরা খুকী আজ কত বড় হয়েছে। কলকাতায় এসে ক'দিন বাদেই কলেজে ঢুকবে। আর সুবিমল সে তো বহরমপুর কলেজের পাণ্ডা। মা মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন, সে বুঝি রাজনীতি করছে ?

নির্ম্মল শুনে হেসে বলে, আর একটু বড় হলে ও ভূত আপনা থেকেই ছেড়ে যাবে। তার জন্যে আর আমাদের এখন থেকে ঝাড়ফুঁক করতে হবে না।

নির্ম্মলের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। রঞ্জিত অনীতাকে নিয়ে দরজার বাইরে থেকে ডাক দেয়, ঘরে ঢুকতে পারি নির্ম্মলদা ?

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, বলে ভেতরে আয়, আমি তো তোদের জন্যেই বসে আছি।

অনীতা আজ সেজেছে। কচি কলাপাতা রংএর শাড়ী তার

সঙ্গে গাঢ় সবুজ ব্লাউজ। হাতে গলায় রূপোর গয়না। খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের মালা। হাত তুলে নমস্কার করে বলে, আমাদের আসতে কি খুব দেরি হয়েছে নির্ম্মলদা ?

—না, সময় তো কিছু দেওযা ছিল না। জানতাম বিকেলবেলা আসবে, এই অবধি।

—কই আপনি এখনও তৈরী হননি যে ?

নির্ম্মল হাসে, তোমরা আসবে বলে কি আর আমাকে বিশেষভাবে তৈরী হতে হবে ?

রঞ্জিত কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, বাড়ীতে চিঠি লিখছিলে বুঝি ?

—হ্যাঁরে, মার শরীরটা ভাল নেই।

—ও তোমাকে বলা হয়নি। মাসীমার চিঠি কাল পেয়েছি। এ চিঠিতেও জানতে চেয়েছেন মেয়ের ছবি তোমার পছন্দ হল কিনা।

—মা দেখছি তোকে খুব মুরুব্বি ঠাউরেছেন।

অনীতা আবদারের সুরে বলে, ছবিটা আমাকে একবার দেখান না নির্ম্মলদা। আমি মুখ দেখে মানুষের চরিত্র বলতে পারি।

নির্ম্মল হাসে, জ্যোতিষ শাস্ত্রও পড়া আছে নাকি ?

—না এ হ'ল সামুদ্রিক গণনা। দিন না ছবিটা—

অগত্যা নির্ম্মল দেরাজ থেকে ছবিটা এনে অনীতার হাতে দেয়। বলে, তোমরা বস আমি আসছি—নির্ম্মল পাশের ঘরের বেয়ারাটাকে চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করার আদেশ দিয়ে যখন ফিরে আসে, দেখে অনীতা তখনও ছবিটার দিকে তাকিযে আছে। নির্ম্মলকে জিজ্ঞেস করে, কি নাম মেযেটির ?

—ঠিক মনে নেই, বোধহয় মাধুরী।

—হ্যাঁ, ঐ রকমই হবে। বয়স বছর সতেরো। একবার ম্যাট্রিক ফেল করে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তবে চতুর্দ্দিকে বিয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় পড়ার তত মন নেই।

নির্ম্মল ঠাট্টা করে বলে, রঞ্জিত, অনীতা দেখছি খনার সেকেণ্ড এডিশন—

অনীতা কিন্তু গম্ভীর মুখে বলে যায়, চেহারা খুব ভাল না হলেও মুখে আলগা শ্রী আছে। তবে রঙের জ্ঞানটা একেবারে নেই। সে অবশ্য কলকাতায় এসে আমাদের হাতে পড়লেই হয়ে যাবে। পতি সেবায় পারদর্শিনী, গৃহকর্ম্মে নিপুণা। আর সবচেয়ে বড় কথা লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। যখন যেখানে থাকবে টাকার অভাব হবে না, বলুন ঠিক মিলছে ?

নির্ম্মল সায় দিয়ে বলে একেবারে হুবহু মিলেছে। মেয়েটি ইংরিজী অনার্সে বি এ পাশ করে এম এ পড়বে কি না—

রঞ্জিত হো হো করে হেসে ওঠে, ব্যস, ব্যস নির্ম্মলদা, আর বলতে হবে না। বোঝা-ই যাচ্ছে খনার বচনের এ এডিশনটা তেমন ওতরায়নি।

অনীতা চটে গিয়ে বলে, তোমায় আর অত হাসতে হবে না—

—আহা চট্‌ছো কেন ?

—আমি যা বলি তাতেই তোমার ঠাট্টা করা চাই।

- এই তো নির্ম্মলদা রয়েছেন, একেবারে থার্ড পারসন, সিঙ্গুলার নাম্বার। তুমিই বলোতো, আমি কি—

নির্ম্মল স্মিত হাসে, এখানে রাগারাগি চলবে না। রঞ্জিত তুই সত্যি বড় পেছনে লাগিস্—

নির্ম্মলকে নিজের পক্ষে পেয়ে অনীতার হাসি ফোটে, রঞ্জিতের ঐরকমই স্বভাব। এই যদি দেখতেন মার্জারী বোস কোন কিছু প্রেডিক্ট করেছে, রঞ্জিত ওর সঙ্গে 'কিরো'র তুলনা করে বসতো—

রঞ্জিত হেসে বাধা দেয়, ও বেচারীকে এর মধ্যে টানছ কেন ?

—আহা বেচারী বইকি, তোমার দরদ দেখে আর বাঁচিনা—

আচ্ছা নির্ম্মলদা তুমি তো মার্জারীকে দেখেছো। গোলগাল ভাল মানুষটী—

অনীতা ফোড়ন কাটে, শুধু নামটাই যা মার্জারী। ভাগ্যিস লরেটোতে পড়েছে, নিজের নামের মানেটা যদি বুঝত—বলেই অনীতা হেসে গড়িয়ে পড়ে। নির্ম্মল আর গম্ভীর থাকতে পারে না বলে অনীতা তো বেশ মজার কথা বলতে পারে।

—মজার কথা কেন হবে, সব সত্যি কথা। মার্জারী বোস তার গোল মুখটাকে সরু করার জন্যে যে কত রকম চেষ্টা করে। রোজই প্রায় সিঁথি পাল্টে পাখী টেরী কাটে। মুখে বিউটিস্পট দিতে গিয়ে অনুস্বর আর বিসর্গয় ভরে যায়। কিন্তু তারই পিছু এদের আর ছোটার বিরাম নেই।

রঞ্জিত হাসতে হাসতে বলে, আমরা না হয় মার্জারীদের পেছনে ছুটলাম। আর তোমরা? বিশ্বাস কর নির্ম্মলদা, ঘাড় পর্য্যন্ত বাবরী কাটা একটা ছেলে, টিপিক্যাল লবঙ্গলতা। ফিল্ম-এ নাকি নাম করেছে। আসল নামটি নেপাল আর ছবিতে নাম দিয়েছে স্বরূপকুমার। কালো চশমা পরে ঠিক দুপুর বেলা হুড্ খুলে গাড়ী চালায়। আর গাড়ীর বাঁশী শুনলেই মডার্ণ রাধিকারা সব বারান্দায় বেরিয়ে পড়ে।

অনীতা ফোঁস করে ওঠে, নেপালদা মোটেই সেরকম ছেলে নয়—

—শুনলে তো নির্ম্মলদা. এর সম্বন্ধে কিছু বল্লে হল, ওমনি অনীতার 'খারাপ বই'-এ তুমি পড়ে যাবে।

অনীতা এবার সত্যি সত্যি চটে যায়। বিরক্ত হয়ে বলে. ছ'টাতো বেজে গেল আর কখন সিনেমায় যাবে?

নির্ম্মল বিস্মিত হয়, সেকি, সিনেমায় যাবার কথা আছে নাকি? এখনও তো চা খাওয়া হয় নি।

নির্ম্মল ব্যস্ত হয়ে বেয়ারাকে ডাক দেয়।

অধীরস্বরে অনীতা বলে, না না, এখন চা খেতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। টেবিল থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে রঞ্জিতকে তাড়া দেয়, চলনা, দেরি করছ কেন?

রঞ্জিত গম্ভীর হয়ে যায়, আজ আর সিনেমায় নাই গেলে—

—তাহলে বলেছিলে কেন? আমার তো বেরুবার ইচ্ছেই ছিল না। মিছেমিছি আনবার কি দরকার ছিল!

—আহা তখন তো ভাবিনি এত দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া নির্ম্মলদা—

—বেশ তোমরা গল্প কর, আমি একলাই যাচ্ছি—

উত্তরের প্রতীক্ষা না করে অনীতা হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায়।

নির্ম্মল ব্যস্ত হয়ে পড়ে, রঞ্জিত শিগ্‌গির যা। বেচারী বড্ড চটে গেছে—

রঞ্জিত লজ্জিত হয়, তুমি কিছু মনে কোর না নির্ম্মলদা, আমরা আর একদিন আসব।

রঞ্জিত চলে যেতে নির্ম্মল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অনীতার মত একগুঁয়ে জেদী মেয়ে নির্ম্মল আগে কাউকে দেখেছে বলে মনে হয় না। তবে বিচিত্র কিছু নয়, কলকাতার সহরে বিষমাখা আবহাওয়ায় যারা মানুষ হয়েছে এতটুকু গণ্ডির মধ্যে যাদের জীবন, তারা নিজেরটুকু ছাড়া যে আর কিছুই ভাবতে পারে না এতে আর আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে। দুঃখ হয় মাসীমার জন্যে। একমাত্র পুত্রবধূ হয়ে অনীতা যদি ঘরে আসে তিনি নিশ্চয় সুখী হবেন না। শুধু তাই নয়, রঞ্জিতের কপালেও অনেক দুঃখ আছে।

নির্ম্মলের মন হতাশায় ভরে যায়, এই সব চিন্তার মধ্যে কতক্ষণ কেটে গেছে নির্ম্মলের খেয়াল ছিল না। দরজায় টোকা পড়তে তার চমক ভাঙে, নির্ম্মল সাড়া দেয়, দরজা খোলা আছে।

সাবলীল ভঙ্গিতে ঘরে ঢোকে অনীতা। চোখে মুখে তার হাসি। বিস্মিত নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, একি, তোমরা সিনেমায় যাওনি?

—যা দেরি করে দিলেন, তখন গেলে সবাই হাসবে যে?

—রঞ্জিত কোথায়?

—নীচে গাড়ীতে বসে আছে।

—তার মানে ?

—আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এলাম। চলুন নির্ম্মলদা একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি—

সত্যি যাবে ?

অনীতা তরল গলায় বলে, আপনি চট্ করে জামা কাপড় ছেড়ে নিন। আমি ততক্ষণ ঐ কেক পেষ্ট্রির বাক্সগুলো গুছিয়ে নিই। ওখানে গিয়ে বেশ খাওয়া যাবে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তারা যখন নিচে নেমে এল, রঞ্জিত তখন গাড়ীর ষ্টিয়ারিং-এ বসে সিগারেট খাচ্ছে। হেসে বলে, তোমায় ধরে এনেছে তাহলে নির্ম্মলদা—

গাড়ীতে বসে নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, তুই ওপরে এলি না যে ?

একটু জিরোচ্ছিলাম। এখান থেকে তিন মাইল টেনে নিয়ে গেল সেই এলিটের মোড় পর্য্যন্ত। সেখানে পৌছেই বল্লে গাড়ী ঘোরাও। জিজ্ঞেস করলাম কোথায় ? তখন বল্লে নির্ম্মলদার বাড়ী। উনি একলা আছেন, ওকে নিয়ে চল আমরা বেড়িয়ে আসি। জিজ্ঞেস করলাম তাহলে এতক্ষণ মরি বাঁচি করে সিনেমা দেখতে ছুটে এলে কেন ? তখন—

অনীতা পেছনের সিট থেকে হাত বাড়িয়ে রঞ্জিতকে চিম্‌টি কাটে-থাক্ তোমাকে আর সব কমা, ফুলষ্টপ দিয়ে রিপোর্ট করতে হবে না।

নির্ম্মল মনে মনে ভাবে রঞ্জিতের কথা ঠিক, সত্যই আশ্চর্য্য মেয়ে অনীতা!

রবিবারের সকাল। নির্ম্মল ট্রাম থেকে নেমে বাজারের ষ্টলের কাছে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায়। দোকানদার নির্ম্মলকে চেনে। তাই মিছেমিছি ব্যস্ত করে না। বরং অনেক সময় বলে, কই এমাসের চিত্রলিপি দেখলেন না ? নতুন বেরলেও বেশ বিক্রি হচ্ছে।

নির্ম্মল মন্তব্য করে, সিনেমার পত্রিকা যে ব্যাঙের ছাতার মত গজাচ্ছে।

—ঐ সবই তো আজকাল বিক্রি হয়।

—তাই দেখছি।

পত্রিকা ফেরত দিয়ে নির্ম্মল চলে আসছিল, কার যেন গলা শুনে থেমে যায়।

দিন না ওই বইটা, কত দাম? কি সুন্দর!

এক সঙ্গে এতগুলো কথা, নির্ম্মল ফিরে তাকায়, সন্দেহ অমূলক নয়। অরুণা ইংরাজী পত্রিকা দেখছে। পরনে তার সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সাজ। লাল পাড় সাদা শাড়ী, মাথায় ঘোমটা কপালে সিন্দুরের বড় টিপ। ভিজে চুলগুলো পিঠের উপর ছড়ানো। সিঁথিতে সিন্দুর সে সব সময়েই দেয় কিন্তু এভাবে গৃহস্থের বউএর সাজে নির্ম্মল তাকে দেখেনি।

—অরুণা! তুমি একা? নির্ম্মল কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে।

—নির্ম্মলদা আপনি? এই কাগজটা দেখেছেন?

নির্ম্মল সে কথার উত্তর না দিয়ে আবার প্রশ্ন করে, তুমি কি একা এসেছ?

অরুণা হেসে ফেলে, সেই ভ্যাবলা হাসি, কি যে বলেন। আমি কি একা বের হই? দাদা আছে ঐ চায়ের দোকানে। এই ছবিটা দেখুন না—

নির্ম্মল ছবির দিকে তাকায়, বিমান বাহিনীর কোন এক পাইলটের ছবি। প্রশ্ন করে, কার ছবি?

অরুণা হাসে, বড় ক্লান্ত হাসি। নীচু গলায় বলে, চিনতে পারলেন নাতো, আমার স্বামী।

—তোমার স্বামী?

অরুণা খুব চাপা গলায় বলে, হ্যাঁ এরই সঙ্গে আমার বিয়ে

হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের রাতেই ওকে চলে যেতে হয়। আর আসেনি। তবে খবর পেয়েছিলাম ও মিলিটারীতে আছে।

নির্ম্মল বিস্মিত হয়, ওর কাছ থেকে কোন চিঠি পাওনি?

—চিঠি? অরুণা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। বলে, চিঠি ও নিশ্চয় লেখে কিন্তু আমি পাই না। মা, দাদা যে পায় নষ্ট করে ফেলে। আমায় পড়তে দেয় না।

নির্ম্মল বোঝে অরুণার সঙ্গে এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা ভুল, লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

অরুণার দাদা সরোজ পান চিবুতে চিবুতে এসে পড়ে। নির্ম্মল বলে, চলুন সরোজবাবু, বাড়ী ফেরা যাক।

—চলুন! সংক্ষিপ্ত উত্তর সরোজের। দেখলেই মনে হয় নির্ব্বিকার মানুষ। পাশে পাশে চলে, কথা বলে কম।

নির্ম্মল অরুণাকে প্রশ্ন করে, আজকে অমন সাজে তুমি বেরিয়েছ কেন?

—শুনলে আপনি হাসবেন। অরুণার চোখ জলে ভরে যায়, কাল একজন আমায় জানিয়েছিল এই পত্রিকায় ওর ছবি বেরিয়েছে। আজ গঙ্গায় চান করে শুদ্ধ হয়ে ছবি দেখতে বেরিয়েছিলাম। আগে দু'টো স্টলে ছবি দেখেছি, তারপর এখানে। পয়সা নেই বলে বইটা কিনতে পারলাম না।

নির্ম্মলের মনে পড়ে যায় এই পত্রিকাটা সে আগে কোথাও দেখেছে, বোধ হয় রঞ্জিতের ঘরে।

নির্ম্মল ঠিক করেছিল সন্ধ্যাবেলা মাসীমার বাড়ী গিয়ে রঞ্জিতের কাছ থেকে ছবিটা চেয়ে নেবে। কিন্তু সানি পার্কে এসে দেখে রঞ্জিত শুধু একাই নয়, অনীতাও রয়েছে। মাসীমাদের আজও বাইরে

খাওয়া, এই সুযোগে রঞ্জিত অনীতাকে খেতে ডেকেছে। নির্ম্মলকে দেখে অনীতা খুশী হয়। বলে আপনি এসেছেন তবু দুটো কথা বলে বাঁচব—

নির্ম্মল বলে, কেন রঞ্জিত আজকাল মৌনী নিয়েছে না কি ?

—ওর সঙ্গে তো কথা বল্লেই ঝগড়া।

রঞ্জিত কথাব মাঝখানে বলে ওঠে, নির্ম্মলদা, আজকে রাগের কারণটা কি জানো ? আমি শুধু বলেছিলাম ছেলেরা সব বিষয়ে মেযেদেব চেযে শ্রেষ্ঠ। ব্যস, এইতেই—

নির্ম্মল থামিযে দেয়, একটা কথা বল্লেই তো হয না, তা প্রমাণ করা চাই।

—প্রমাণ তো একশ বার কবছি। খেলা ধুলোয বড কারা, ছেলেরা। গান বাজনায ওরাই ওস্তাদ। রাজনীতি, বাবিষ্টাবী, ডাক্তাবী সবেতেই—

অনীতা নির্ম্মলকে বলে, দেখেছেন্ তো কি বোকার মত কথা বলছে। মেযেদের কি ওইসব লাইন ?

—আহা, তোমাদের লাইনটা কি তাই বল না। যদি বল রূপচর্চা, তাও সব ভাল মেক্ আপ্ ম্যান ছেলেরা।

আর যদি বল রান্নাবান্না, দেখতে পাবে সব ভাল হোটেলে হয খানসামা নয বামুন রাঁধছে।

অনীতা কি বলতে যাচ্ছিল, নির্ম্মল থামিযে দিযে বলে সত্যি তুই অনীতাকে বড্ড রাগাস। যা দেখি, ঘর থেকে ইংরিজী ম্যাগাজিনের তাড়াটা নিযে আয়।

—কেন বলো তো ?

—মনে আছে, কয়েক দিন আগে ভারতীয বিমান চালকদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—

—হঠাৎ সেটার কি দরকার পড়ল ?

—একজনের ছবি দেখব। যাতো চট্ করে নিয়ে আয়। রঞ্জিত

ম্যাগাজিন আনতে উঠে যায়। অনীতা নিজের থেকেই বলে, আপনাকে আজ খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, কিছু ভাবছেন বুঝি ?

অন্যমনস্ক নির্ম্মল সায় দেয়, হ্যাঁ ভাবছি একটি মেয়ের কথা। বড় ট্র্যাজিক্—

—কার কথা বলছেন ? অরুণা।

—তুমি কি করে জানলে ?

—রঞ্জিত আমায় সব বলেছে। ওকি আর সারবে না নির্ম্মলদা—

—কি জানি ভাই বুঝতে পারছি না।

রঞ্জিত ফিরে আসে। একটা পত্রিকা দেখিয়ে বলে এটা খুঁজছিলে ?

নির্ম্মল সম্মতি জানায়। একটা ছবির উপর হাত রেখে বলে, এ ছবিটা দেখেছিস ?

—কার ছবি ?

—অরুণা বলছে এ নাকি ওর স্বামী।

—সেকি ?

তিনজনেই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে—প্রবন্ধের শিরোনামায় লেখা 'যে সব বিমান চালক আজ পরলোকে'। বুঝতে বাকী থাকে না, অরুণা আজ যাকে স্বামী বলে দাবী করছে সে এজগতে নেই।

অনীতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ভাগ্যিস অরুণা এখবর পায়নি। তাহলে হয়ত আরো বেশী শক্ পেতো।

রঞ্জিত কি ভাবছিল। জিজ্ঞেস করলে, অরুণার মা এবিষয়ে কোন কথা বলে না ?

নির্ম্মল উত্তর দেয়, কখনও তো শুনিনি।

—একবার জিজ্ঞেস করে দেখনা—

—তাই ভাবছি।

সেদিন রাত্রিবেলাই মাসীমার বাড়ী থেকে ফিরে নির্ম্মল দেখা করল অরুণার মার সঙ্গে। অরুণার মা ছবি দেখে চমকে উঠেন, বলেন, এ ছবি তোমায় কে দেখালে ?

নির্ম্মল ছোট্ট উত্তর দেয়, অরুণা—

—তাই দেখছি। পাগলামীর বহরটা ওর বেড়েছে। তুমি ভাবতে পারবে না বাবা এই লোকটা আমাদের কত সর্ব্বনাশ করেছে।

—এর সঙ্গে আপনাদের কতদিনের আলাপ?

—অনেকদিন। অরুণার বাবা তখন বেঁচে। সে সময় আমাদের অবস্থা ভাল ছিল। তার ওপর শেয়ার মার্কেটের টাকা জিতে উনি অনেক পয়সা করেছিলেন। গাড়ী বাড়ী ঝি চাকর সব কিছুর বাড়াবাড়ি। তখন অনেক লোকই আসত দেখা করতে। তাদের মধ্যে একজন অরুণার বাবার খুব প্রিয় পাত্র হয়ে পড়ে, সে-ই রমেশ—

—রমেশ কে?

—যার ছবি দেখাচ্ছিলে। রমেশ দেখতে খুব সুন্দর ছিল, লম্বা চওড়া চেহারা—

অরুণা কি রমেশের সঙ্গে খুব বেশী মিশতো?

আমাদের বাড়ীতে ছিল অবাধ মেলামেশা। তাই রমেশের সঙ্গে বেশী মিশছে কিনা লক্ষ্য করে দেখিনি। অরুণা যে ওকে ভালবাসে তা জানতে পারলাম অনেক পরে। তখন সর্ব্বনাশ হযে গেছে।

—তার মানে?

অরুণার মার চোখ ছল ছল করে ওঠে, শেয়ারে প্রচুর লোকসান দিয়ে দেনার দায়ে বাড়ী ঘর সব বিক্রী করে উনি কোন রকমে নিজের মান বাঁচালেন। রাতারাতি আমরা গরীব হযে গেলাম, রমেশও আমাদের কাছে আসা বন্ধ করে দিলে। সেই থেকে অরুণার মাথা খারাপ হযে যায়, পাগলামীর ঝোঁকে বলতো রমেশের সঙ্গে নাকি ওর বিয়ে হয়েছে—

—এ কি সত্যি নয়?

—সামাজিক নয় তা আমি জানি, তবে ওদের মধ্যে মানসিক কোন সম্বন্ধ হয়েছিল কিনা জানি না। সে কথা কখনও বলেনি—

—তারপর রমেশ আর আসেনি ?

—না, শুনেছিলাম উড়োজাহাজ চালায়। মা থামেন, আবার কি ভেবে বলেন, মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করে রমেশ কোন চিঠি লিখেছে কিনা, কিছু বলতে পারি না। ও ভাবে আমি বোধ হয়, ওকে চিঠি পড়তে দিই না, অথচ রমেশের কোন চিঠিই আমি পাইনি—বলা উচিত হবে কিনা ভেবে নির্ম্মল ইতস্ততঃ করে, আপনি জানেন কি রমেশ মারা গেছে ?

মা নির্ব্বিকার। বলেন, হ্যাঁ, সে খবরও আমি পেয়েছি। কিন্তু অরুণাকে আমি জানাইনি। তাঁর চোখ জলে ভরে আসে। কথা বলতে গিয়ে গলা কাঁপে, দোহাই তোমার, অরুণা একথা যেন টের না পায়, তাহলে ওকে বাঁচাতে পারবো না।

কলকাতা-জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাও নির্ম্মল যার সঙ্গে আলাপ করে সে হোল শোভনা বৌদি। এই সদা হাস্যময়ী বৌদিটির আশ্চর্য্য ক্ষমতা পরকে আপন করে নেবার। নির্ম্মলকে ঠিক নিজের দেওরের মতই কাছে টেনে নিয়েছেন। নির্ম্মল সময় করে রোজই প্রায় একবার মণীশবাবুর ফ্ল্যাটে আসে। কারণ সে না গেলে বৌদি অকারণে ব্যস্ত হন, বারবার লোক পাঠিয়ে তার খবর নেন।

নির্ম্মল কত সময় বলেছে, আপনি একটুতেই এত ব্যস্ত হন কেন ?

শোভনা বৌদি হেসে উত্তর দেন, কি করব ভাই, কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে—

—আমার মার কিন্তু দেখেছি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য। সহজে বিচলিত হন না। একবার আমার ছোটভাই পার্কে রেলিঙ্ টপকাতে গিয়ে পড়ে যায়। ছুঁচ্‌লো লোহার রেলিঙ্ ওর পাঁজরার পাশ দিয়ে ঢুকে গেল পেটের মধ্যে। চীৎকার শুনে সবাই যখন ছুটে এল সুবিমল তখন রেলিঙের ওপর ঝুলছে—

বৌদি শিউরে ওঠেন, সর্ব্বনাশ, তারপর ?

—মা কিন্তু এতটুকু অস্থির হননি। নিজে হাতে ব্যাণ্ডেজ করে গাড়ী ডাকিয়ে সুবিমলকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন।

—আমি হলে কিন্তু পারতাম না। সেবার ছোট খোকার অসুখের সময় হঠাৎ একদিন জ্বর ছেড়ে গিয়ে হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি তো ভযে মরি। উনিও বাড়ীতে নেই। তখন পাশের ফ্ল্যাটে যে পাঞ্জাবীরা থাকত, তাদেরই গিয়ে ডেকে আনলাম, তারাই ডাক্তারকে খবর দেয, ছেলেকে দেখে, সব কিছু করে দেয। আমার তো নিজেরই হাত পা ঠাণ্ডা হযে যাচ্ছিল—

—আমার মাকে দেখলে আপনার ভাল লাগবে।

—উনি এখানে এলে আমিও নিশ্চিন্ত হই। মার কাছে কত কি শিখতে পাবব।

অনীতার সঙ্গে আলাপ হওযার পর থেকে ওদেব বিষয অনেক কথা নির্ম্মল শোভনা বৌদিকে বলেছে, তাদের হাসি ঠাট্টা, মান অভিমান সবকিছু। বৌদি প্রায়ই বলেন, একদিনও তো আমার কাছে নিযে এলে না। রঞ্জিত, অনীতা, ওদের দু'জনকেই বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

নির্ম্মল উত্তর দেয, বলেছি তো নিযে আসব একদিন—

—ওই একদিনটা একটু তাড়াতাড়ি কর না। অনীতার কথা শুনে মনে হয ও নিশ্চয খুব ভাল মেযে—

—তা অস্বীকার করি না, তবে মাসীমা ওকে নিযে ঘব করতে পারবেন কিনা বলা শক্ত।

বৌদি ব্যথিত হন, একথা কেন বলছ ?

—অনীতার সব ভাল, রূপ আছে, গুণ আছে, কিন্তু বড় একগুঁয়ে। বাড়ীর মেয়ে জেদী হলে খুব বেশী এসে যায় না, কিন্তু ঘরের বউ অশান্তির সৃষ্টি করে।

শোভনা বৌদি ঘন ঘন মাথা নাড়েন, একথা আমি মানতে রাজী নই

ঠাকুরপো। মেয়েরা সব কিছু মানিয়ে নিতে পারে। অনীতাকে বিয়ের আগে দেখেছ বলেই ভয় পাচ্ছ, ভাবছ সে এই রকমই একগুঁয়ে থাকবে। কিন্তু ধর যদি রঞ্জিতের মেয়ে দেখে বিয়ে ঠিক হত, যেমন আমাদের হয়েছে—তখন তো অনীতার চেহারা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতে না!

সে কথা সত্যি, কিন্তু জানতে পেরে চুপ করে থাকা তো সোজা কথা নয়। তার ওপর আমার বিপদ হ'ল মাসীমার কাছে অনীতা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে হবে, কি বলব তাকে?

—ভালই বলবে, দেখ বিয়ের পরও সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

নির্ম্মল তবুও ইতস্ততঃ করে, হয়ত যাবে। কিন্তু ভয় হয় কোথায় জানেন, যখনই মনে হয় অনীতা শুধু জেদিই নয় স্বার্থপরও। ঐ একটা দোষেই কত সুখের সংসার যে ছারখার হয়ে গেছে তা জানি বলেই ভয় পাই।

কথাটা সহজ করে দেবার জন্যে বৌদি হেসে বলেন, তোমাকে আর বেশী ভাবতে হবে না, ওদের দু'জনকে এখানে নিয়ে এস তো, অনীতা সম্বন্ধে আমি যে রায় দেব নির্ভয়ে মাসীমাকে বলে এসো—

নির্ম্মলও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তথাস্তু।

এরই মধ্যে একদিন শোভনা বৌদি জরুরী তলব পাঠালেন নির্ম্মলের কাছে। নির্ম্মল ঘরে ঢুকতেই ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি নাকি শুনলাম রাতুল ঘোষের কাছে খুব যাও আজকাল?

নির্ম্মল অবাক হয়, কেন, কি হয়েছে?

না, না, ওর সঙ্গে বেশী মিশতে হবে না।

নির্ম্মল হাসবার চেষ্টা করে, আমি কি করি খোকা—

তুমি জাননা ভাই ও কিরকম বদ্‌লোক। উনি বলছিলেন কদিন একটা হোটেলে মদ খেয়ে এমন মাতলামী করেছে সেখানকার লোক ঘাড় ধরে রাস্তায় বের করে দিয়েছে। এক ভদ্রলোক বুঝি দয়া করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ছিল।

—লোকটা মদ খায় আমি জানি, কিন্তু এতখানি মাতাল হয় আমি জানতাম না।

বৌদির বিস্ময়ের অবধি থাকে না, একথা জেনেও তুমি তার সঙ্গে মিশছো ?

—মদ খেলেই তো লোক খারাপ হয় না বৌদি।

বৌদি অন্যমনস্ক হয়ে যান, কি জানি উনি তো বলেন লোকটা জানোয়ার—

—অরুণাও তাই বলে, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না। মনে হয় রাতুল ঘোষের ভেতরটা খুব নরম, বিশেষ করে ও ভাগ্নেদুটিকে খুবই ভালবাসে—

বৌদি নীরস কণ্ঠে বলেন, উনি তো বলেন ওরা ওর ভাগ্নে নয়—

—তার মানে ? নির্ম্মল বিস্ময়।

—ঐ বাচ্চা দুটি ছাড়া আর কেউ তো আসে না, উনি বলেন এর মধ্যে গোলমাল আছে—

নির্ম্মলের এই প্রথম মনে হল সত্যিই তো রাতুল ঘোষের আত্মীয় স্বজন কারুর কথাই সে তার কাছে এ পর্য্যন্ত শোনেনি।

রাতুল ঘোষ সম্বন্ধে নির্ম্মলের কৌতূহল আরও বেড়ে যায় দিন সাতেক বাদে। নির্ম্মল গিয়েছিল লেকের ধারে বেড়াতে। সেখানেই রাতুল ঘোষের সঙ্গে দেখা, ভাগ্নেদের নিয়ে গাড়ী করে বেড়াতে এসেছে। সেই এক সাজ। খাকী হাফপ্যাণ্ট, সাদা সার্ট আর কাবলী জুতো, মোটা মানুষ, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে গিয়ে হাঁপিয়ে অস্থির। নির্ম্মলকে দেখে আনন্দের সঙ্গে বলে এরা আমাকে ঘোড়দৌড় করিয়ে মারলে মশাই। ভুঁড়ি নিয়ে আর কি পারি ?

নির্ম্মল স্মিত হাসে। সত্যি বড় হাঁপিয়ে পড়েছেন। এইখানে ঘাসের ওপর বসে একটু জিরিয়ে নিন।

—বসতে দিলে তো, এখুনি এসে টানাটানি করবে, বিশেষ করে সুজিতটা, যা দুষ্টু।

কথা বলতে বলতে রাতুল ঘোষ নির্ম্মলের পাশে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে পড়ে।

নির্ম্মল বলে, আপনার দুটি ভাগ্নেই বড় সুন্দর।

—কিন্তু বড় আবদেরে।

—বোধহয় মামার কাছেই—

—ঠিক ধরেছেন নির্ম্মলবাবু, আমার কাছে এলেই ওদের যত বায়না, অথচ ওর মার কাছে একেবারে সুবোধ বালক, এই দেখুন না কি মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে আসছে।

সুজিত আব সুনীর্ম্মল দুজনেই ফুটফুটে ছেলে। নির্ম্মলকে দেখে প্রথমটা একটু আড়ষ্ট হলেও সাবীলল ভঙ্গিতে মামার কাছে এগিয়ে যায়। বলে, আজ কিন্তু মুড়ি খাবার দিন।

রাতুল ঘোষ উত্তর দেয়, মোটেই না।

—বাঃ তুমি না পরশুদিন বল্লে লেকে যেদিন আসবে মুড়ি খাওয়াবে।

সুনীল আরও যোগ দেয়। ঐ যে বুড়ো আসছে, 'আজিকার ভাজা মুড়ি'।

—না, না, আজকে নয়। তোদের মা শুনলে আর বেরতেই দেবে না। চারদিকে অসুখ বিসুখ হচ্ছে।

—তাহলে আসক্রীম খাব।

—শুনছেন নির্ম্মলবাবু এদের কথা। মুড়ি খেতে দিচ্ছি না, তাই বলে আইসক্রীম খাবে। ওদের মা এদিকে—

—মা তো বারন করেনি, বলেছে তোমায় জিজ্ঞেস করে খেতে।

—বেশ, তাহলে চীনে বাদাম খাও; ওই একটা জিনিষ যা খোলার মধ্যে থাকে, কি বলুন নির্ম্মলবাবু, রোগ ঢোকবার ভয় নেই।

সুজিতেরা চীনে বাদাম-ওয়াল্লাকে ডেকে আনতে যায়।

নির্ম্মল বলে, আপনিতো খুব সাবধানী দেখছি।

—কি করব ভাই, পরের ছেলে। কিছু একটা হলে আমায় দুষবে।

—আপনাকে সংসারী হলে খুব মানাবে।

রাতুল ঘোষ হা হা করে হাসে। সেই কান এঁঠো-করা হাসি। এ জন্মে বোধহয় আর হল না।

—কেন, আপনার আর এমন কি বযেস, ভাল ঘটক বিদায়ের কথা দেন তো মেয়ে খুঁজতে সুরু করি।

—মেযের বাড়ী গিযে কি বলবেন? পাত্রের চোখে চালশের চশমা, চেহারায হোঁদল কুৎকুতের দ্বিতীয় সংস্করণ আর গুণের মধ্যে মদ্যপায়ী, কি বলুন নির্ম্মলবাবু? এর পরেও যদি কোন মে বরমাল্য দান করে, আমি তাকে একগাছি দড়ি আর কলসী উপহার দেব।

—তার মানে আপনি ঠিকই করেছেন চিরকুমার থাকবেন?

রাতুল ঘোষ আবার হাসে, আমি ঠিক করিনি, যিনি আমাদের স্বৃষ্টি করেছেন তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন।

যাক্‌গে সে কথা, একটা ভাল লোক দিতে পারেন?

—কেন বলুন তো?

—আমার অফিসের জন্যে একটা ক্যাশিয়ার খুঁজছি। জানেন তো আজকালকার দিনে বিশ্বাসী লোক পাওয়া কত শক্ত।

—কোয়ালিফিকেশান কি চান?

—শুধু বিশ্বাসী হলেই হবে।

এ বিষয় আর কথা হয় না। সুজিতেরা চিনেবাদামওয়ালাকে পাকড়াও করে আনে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে রাতুল ঘোষ, নির্ম্মল ও বাচ্চাদের নিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ে।

—আপনার তাড়া নেই তো নির্ম্মলবাবু? এদের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আমরা ফিরব।

—সে ঠিক আছে।

পথে সুজিত গাড়ী থামায়, মামা তুমি আবার ভুলে গেছ একটা জিনিষ।

—কি বল্‌তো?

—কড়া পাকের সন্দেশ।

—ঠিক বলেছিস। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি এক মিনিট বসুন নির্ম্মলবাবু আমি মিষ্টি নিয়ে নিই।

রাতুল ঘোষ দোকান থেকে যখন ফিরে আসে, সুনীল আর সুজিতের হাতে মিষ্টির বাক্স। নির্ম্মলকে বলে, বেশী দেরি করিনিতো? চলুন আর কোথাও থামবো না।

বাচ্চাদের নামাতে গাড়ী থামল ভবানীপুরে পার্কের সামনে একটা ছোট বাড়ীতে। গাড়ীর হর্ণ শুনে দরজায় এসে দাঁড়ালেন সুজিতের মা। নির্ম্মলকে দেখে একটু আড়াল থেকেই ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, মামা নামবেন না?

রাতুল ঘোষ গাড়ী থেকে উত্তর দিল, আজ আর নয়, আর একদিন আসব।

—একটা কথা শুনে যাও।

নির্ম্মলকে বসতে বলে রাতুল ঘোষ নেমে যায়। ততক্ষণ সুজিত আর সুনীল মাকে ঘিরে বক বক করতে সুরু করেছে। মা তাদের থামিয়ে দেন, যাও সন্দেশের বাক্সগুলো ঘরে রেখে এস।

তারা কলরব করে চলে গেলে মৃদুকণ্ঠে রাতুল ঘোষকে জিজ্ঞেস করেন, গাড়ীতে উনি কে?

নির্ম্মলবাবু, যার কথা তোমায় বলেছিলাম।

—ওনাকে নামাবে না।

—আজ থাক, আর একদিন বরং নিয়ে আসব। রোহিণী কেমন আছে ?

—জ্বর কম, তবে দুর্ব্বল।

—ডাক্তার এসেছিলেন ইন্‌জেক্‌শান দিতে ?

—হ্যাঁ।

—আমি ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে নেব।

—কাল এসো।

রাতুল ঘোষ গাড়ীতে ফিরে আসে, মাপ করবেন নির্ম্মলবাবু, বলেছিলাম কোথাও নামবো না, কিন্তু—

নির্ম্মল অমায়িক হাসি হাসে, ঠিক আছে, চলুন।

গাড়ী চল্‌তে সুরু করে, রাতুল ঘোষ নিজের মনেই বলে, অসুখটা কিছুতেই সারছে না।

—কার ?

—রোহিণী, মানে সুজিতের বাবা।

—কি হয়েছে ?

—ডাক্তাররা তো বলে মানসিক দুর্ব্বলতা। ভালমানুষ লোকদের এই হয়, সংসারের ঘোর প্যাঁচ সহ্য করতে পারে না।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। নির্ম্মল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনাদের দেশ কোথায় ?

রাতুল গাড়ী চালাতে চালাতে বলে, ছিল একদিন পাকিস্থানে—

—বাড়ীর সবাই ?

—কি জানি, কেউ নেই বোধহয়।

—তার মানে ?

—বাপ, মা মারা গেছেন আমার ছোটবেলায়। তবে আত্মীয়-স্বজন ছিল, এখন তাদের খোঁজ রাখি না।

নির্ম্মল কোন কথা বলে না, রাতুল ঘোষ নিজের মনেই বলে, ওরা

আমায় ত্যাগ করেছিল। একরকম একঘরে হয়েই ছিলাম। এখন সেটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে আর কি। বলেই রাতুল ঘোষ হাসে, সেই কান এঁটো করা হাসি।

—ইনি আপনার আপন বোন?

রাতুল ঘোষ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলেন, কার কথা বলছেন?

—সুজিতের মা?

নির্ম্মল লক্ষ্য করে রাতুল ঘোষ থতমত খেয়ে যায়। ইতস্ততঃ করে বলে, না। আমার কোন বোন নেই।

শোভনা বৌদির কথাগুলো নির্ম্মলের মনে পড়ে যায়।

নির্ম্মল অনেকদিন আগেই কথা দিয়েছিল রঞ্জিত আর অনীতাকে এনে শোভনা বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। কিন্তু কিছুতেই সময় করে উঠতে পারছিল না। আজ শনিবার, দুপুর বেলা অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা গেল রঞ্জিতদের বাড়ী। সেখান থেকে তাদের নিয়ে এসেছে মণীশবাবুর ফ্ল্যাটে। বৌদি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, তখনও তাঁর গা ধোওয়া, চুল বাঁধা কিছুই হয় নি।

নির্ম্মল অনীতাকে দেখিয়ে বলে, বৌদি একে চিনতে পারেন?

বৌদি সত্যিই প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে ভাব কাটিয়ে সপ্রতিভ কণ্ঠে বল্লেন, তোমাকে আর চেনাতে হবে না। এসো ভাই অনীতা, আসুন রঞ্জিতবাবু—

সোফায় বসে অনীতা মৃদুস্বরে বলে, কেমন এসে পড়লাম বলুন তো—

—খুব খুসী হয়েছি। নির্ম্মল এত কথা তোমাদের বলে কিন্তু কিছুতেই নিয়ে আসে না। আমি তো বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি।

—নির্ম্মলদার স্বভাবই ঐ রকম। ওর মুখে তো সারাক্ষণ আপনার সুখ্যাতি শুনতে পাই। পাছে আমরা এসে আপনার স্নেহে ভাগ বসাই তাই এতদিন আলাপ করায়নি।

বৌদি হেসে বলেন, দেখছ তো ঠাকুরপো, সব দোষটা তোমার।

নির্ম্মল ইচ্ছে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এখন তো তাই দেখছি।

—কাল বিকেলেও তো বল্লে না আজ এদের নিয়ে আসবে ?

—তাহলে কি হ'ত ?

—প্রস্তুত হয়ে থাকতাম।

—আমি যে সারাক্ষণ আপনাকে অপ্রস্তুত করার চেষ্টা করছি বৌদি।

সকলেই হেসে ওঠে।

বৌদি অনীতাকে জিজ্ঞেস করেন, কি খাবে বল—

—বিকেলে আমি কিছু খাই না—

—সে বল্লে তো হবে না। রঞ্জিতবাবু, আপনার জন্যে কি আনব ?

রঞ্জিত হেসে বলে, আগে বাবুটাকে বাদ দিন তারপর অন্য কথা।

—খাতির করে কথা বলার অভ্যেস আমারও নেই। তবে আজ কাল যা দিন পড়েছে তাই ভয় করে। যখন ভরসা দিচ্ছেন, তখন আপনাকে রঞ্জিত ঠাকুরপো বলে ডাকবো, কেমন ?

অনীতা চট্ করে রঞ্জিতকে বলে, তুমি যতই গায়ে পড়ে আলাপ কর না কেন, বৌদি কিন্তু ঠিক লোক চিনেছেন। আমার সঙ্গে সম্পর্ক না পাতালেও তুমি বল্‌তে বাধে নি, কিন্তু নতুন ঠাকুরপোটিকে আপনি বলেই ডাকছেন।

একথায় বৌদির মুখ সস্নেহ হাসিতে ভরে যায়, আপনি তুমির ঝগড়া থাক, তোমরা বস আমি চা নিয়ে আসি।

নির্ম্মল পদপূরণ করে, দোহাই বৌদি, শুধু চা আনবেন না। অফিস থেকে সোজা আস্‌ছি, বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। খানকয়েক মালপো আর কিছু নারকোল নাড়ু।

বৌদি কপট ভর্ৎসনার সঙ্গে বলেন, ঘরে নেই যা, ছেলে চায় তা। বৌদির হাতের তৈরী পচা জিনিষ তো সকলকে দেওয়া যায়না।

বৌদি ভেতরে চলে যান। অনীতা বলে, সত্যি নির্ম্মলদা, কি মিষ্টি বৌদি আপনার। কত সহজে আমাদের আপন করেন নিলেন।

—ওঁনার স্বামীও তেমনি, এমন আপন ভোলা মানুষ।

—দুজনে জোড় মিলেছে বেশ সুন্দর।

খানিক বাদে বৌদি ফিরে এলেন চা আর গরম সিঙ্গাড়া নিয়ে। নাও গরম গরম সিঙ্গাড়া খেয়ে নাও, মিষ্টি আনতে লোক পাঠিয়েছি।

রঞ্জিত ব্যস্ত হয়ে বলে, এত হ্যাঙ্গামা করার কি দরকার ছিল?

—হাঙ্গামা কেন হবে, প্রথমদিন বৌদির কাছে এলে।—বৌদি কাপে চা ঢেলে দেন।

খাওয়ার সঙ্গে হাসি গল্প চলে। অরুণা এসে পড়ায় আলাপে বাধা পড়ল। সে আজ মাথায় চ্যাপ্টা করে খোঁপা বেঁধেছে, পরনে নীল রংএর শাড়ী। অনীতাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তুমি বুঝি অনীতা, কখন এলে আমায় ডাকনি কেন?

অনীতার হাসি বন্ধ হয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে, এইতো এলাম।

আঙ্গুল দিয়ে রঞ্জিতকে দেখিয়ে বলে ওর সঙ্গে তো তোমার বিয়ে হবে, না?

এ প্রশ্নের কেউ উত্তর দেয় না। অরুণা নিজে থেকেই বলে আমি জানি, নির্ম্মলদা বলেছে।

শোভনা বৌদির কাছে এগিয়ে গিয়ে আবদারের সুরে বলে, বলনা ওদের দু'জনকে পাশাপাশি বসবে একটু প্রাণ ভরে দেখি।

এ কথায় সকলের মন করুণায় ভরে যায়। বৌদি চোখের জল গোপন করেন। অরুণা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়। অনীতার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে রঞ্জিতের পাশে বসিয়ে দেয়।

ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে, কি সুন্দর মানিয়েছে না বৌদি ?

বৌদি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। অরুণা বলে যায়, পাঁচ বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল। তোমাদের কদ্দিন বিয়ে হয়েছে বৌদি ?

—তা প্রায় আঠার বছর হল।

—বিয়ের দিনে খুব উৎসব কর ?

বৌদি হাসলেন, সে বয়েস আর নেই।

—বাঃ, তোমাদের বয়েস আর এমন কি ? একটু থেমে বলে, আমি কিন্তু এবার বিয়ের দিনে খুব সাজব। সুন্দর করে সিঁদুর লাগাবো বেনারসী শাড়ী পরব, খুব মজা হবে। না ?

বৌদি সায় দেন, বেশ তো, আমি তোমার জন্যে যে সোয়েটারটা বুন্‌ছি ঐ দিন উপহার দেব।

—আর একটা জিনিষ দেবে ? অরুণা আবদার ধরে, বৌদির কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে। কথা শুনতে শুনতে বৌদির মুখের চেহারা বদলে যায়। আস্তে আস্তে বলেন, নিশ্চয় চেষ্টা করব। প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে ব্যথায় করুণায় তাঁর চোখে জল এসে পড়ে।

—আর আমি কিছু চাই না। নিজের মনে মাথা নাড়তে নাড়তে অরুণা চলে যায়।

সকলে চুপ করে বসে থাকে। মণীশবাবু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত বিশেষ কথাবার্ত্তা আর হয় না। রঞ্জিতের সঙ্গে পরিচয় হ'তে মণীশবাবু তার পিঠ চাপড়ে বলেন, দুনিয়াটা বড় গোলমেলে, কিন্তু নিজে যদি সোজা থাক দেখবে গোলমাল মিটে গিয়ে সরল হয়ে যাবে সব।

বৌদি বাধা দেন, সব সময় তোমার বড় বড় কথা।

—তুমি বোঝ না। এগুলো বড় দরকারী কথা। কখন কার কাজে লাগে, তুমি আমি বলতে পারবনা। অরুণার কথাই মনে কর না যখন প্রথম প্রথম ওকে বোঝাতে সুরু করলাম তখন কি তোমরা ভেবেছিলে যে ও ক্রমে ভাল হয়ে উঠবে—

অনীতা মাঝখান থেকে বলে, সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে, না মণীশবাবু?

—চেষ্টাতো করছি, জোর করে তো কিছু বলা যায় না৷ আসল দরকার কি জান ওর মনটা ভাল রাখা। মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, নানারকম গল্প করা।

বৌদি বলেন, গল্প করার যে উপায় নেই, বিয়ে বিয়ে করে পাগল।

অনীতা নিজের মনেই বলে, কি ট্র্যাজিক। আচ্ছা মণীশবাবু অরুণাকি সত্যিই বিশ্বাস করে ওর স্বামী ফিরে আসবে?

—তাই তো মনে হয়।

নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, রমেশের কথা অরুণার মার কাছে শুনেছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনার কি মনে হয়?

—অসম্ভব নয়। এরকমও হতে পারে। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কবে কথা হ'ল?

—এই তো দিন কয়েক আগে।

—আশ্চর্য্য।

—কেন?

—আমি অরুণার মাকে বারণ করেছিলাম এবিষয়ে আর কারো সঙ্গে আলোচনা করতে—

—একটা ছবি নিয়ে কথা উঠেছিল—

—কার ছবি?

—রমেশের। অরুণাই আমায় দেখায়। নির্ম্মল সংক্ষেপে সব কথা বলে।

মণীশবাবু দাঁত চেপে বলেন, সরোজ সঙ্গে না থাকলে অরুণার পাগলামী এতখানি বাড়বে কেন ?

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি বলে, কিন্তু সরোজ এবিষয়ে কোন কথা বলে নি ?

লোকটা মিটমিটে শয়তান। মা, বোনের সর্ব্বনাশ করেছে।

কথা বলতে বলতে মণীশবাবু এত বেশী গম্ভীর হয়ে যান যে গল্পের আসর আর জমে না।

ওঠবার আগে অনীতা মণীশবাবুকে বলে, আপনি যে অরুণাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলছিলেন, তাহলে আমরা যেদিন পিক্‌নিকে যাব, ওকেও নিয়ে যাব।

সে তো খুব ভাল কথা—

আপনাদেরও কিন্তু যেতে হবে—

বৌদি হেসে বলেন, তোমাকে আর নেমন্তন্ন করতে হবে না, আমাদের না বল্লেও যাব।

বাড়ী ফেরার পথে রঞ্জিত নির্ম্মলকে বলে, মণীশবাবুরও বোধ হয় মাথার দোষ আছে।

—কেন বলতো ?

—কথায় কথায় রেগে যান কেন ?

—আমি কিন্তু আগে ওনাকে এত চড়া গলায় কথা বলতে শুনিনি।

অনীতা উত্তর দেয়, অরুণার জন্যে খুব ভাবছেন আর কি। সত্যিই তো, কত বড় রেস্‌পন্‌সিবিলিটি। কিন্তু রমেশ লোকটা কি ভয়ানক পাজী তাই ভাবছি—

রঞ্জিত সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, জোর দিয়ে তা বলা যায় না—

—কেন, রমেশের জন্তেই তো অরুণার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল—

মনে কর অরুণার মাথার গোলমাল যদি আগেই সুরু হয়ে থাকে, যা দেখে রমেশ তাকে ছেড়ে চলে গেছে—

অনীতা বাধা দিয়ে বলে, সে তো আরও খারাপ। সে সময় যদি অরুণাকে ভাল হতে কেউ সাহায্য করতে পারত সে একমাত্র রমেশই—

রঞ্জিত শান্ত গলায় বোঝায়, তুমি ভুল করছ অনীতা, পাগলামীটা বংশগত রোগ। রমেশের পক্ষে ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। অরুণার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে সারা জীবনটাই হয়ত দুর্ভোগের মধ্যে কাটাতে হত। এ আর কে সাধ করে চায় বল ?

অনীতা চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, নির্ম্মলদা আপনারও কি সেই মত ?

নির্ম্মল গম্ভীরস্বরে উত্তর দেয়, এ বড় কঠিন প্রশ্ন অনীতা, ঠিক সেই অবস্থায় না পড়লে কি করে উত্তর দেব—

রঞ্জিত কিন্তু জোরের সঙ্গেই বলে, শুনতে নিশ্চয় খারাপ লাগে কিন্তু সত্যিই এ অবস্থায় রমেশকে দোষ দেওয়া যায় না। হাজার হোক একটা হেরিডিটারি রোগ—

—হেরিডিটারি রোগ তো কত রকমের হয়। তাই বলে একটা মেয়ের জীবন—

—তুমি বুঝতে পারছো না অনীতা, সে যে রোগই হোক বাস্তব ক্ষেত্রে যে এর ফল আরও খারাপ। বিয়ের পর স্বামীর জীবনটা নষ্ট করার অধিকার কোনও স্ত্রীরই নেই,ছেলে মেয়েদের উপর অন্যায় করা—আমি বলছি তোমায়, বিয়ে হলে অরুণা আরও বেশী অসুখী হ'ত।

—কি জানি, হয় তো তাই। কথা বলতে বলতে অনীতা অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

বাকী রাস্তা আর কেউ কথা বলেনা।

ক'দিন বাদে অরুণার দাদা সরোজ এসেছিল নির্ম্মলের কাছে।

সব সময় ভদ্রলোকের সঙ্কোচভরা চেহারা। কথা পরিষ্কার করে বলতে পারে না। আজ কিন্তু সোজা এসে নির্ম্মলকে বলে, কটা টাকার দরকার ছিল—

নির্ম্মল অবাক হয়। যে সরোজ সহজে কথা পর্য্যন্ত বলেনা, সে এসে টাকা চাইছে কি করে। বলে বসুন—

—না বসবো না। ক'টা টাকা—

—কত টাকা ?

সরোজ ঢোক গেলে, বত্রিশ টাকা। আমার কাছে একটা সোনার আংটি আছে। সেটা জমা রেখে যদি টাকা কটা—

নির্ম্মল বাধা দেয়। সে কথা হচ্ছেনা, কি দরকার ?

ডাক্তার দেখাতে হবে। আর কোন কথা না বলে সরোজ চুপ করে থাকে—

নির্ম্মলের কেমন যেন দয়া হয়, বলে, অপেক্ষা করুন টাকা দিচ্ছি।

দেরাজ থেকে টাকা এনে সরোজের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করে কবে নাগাদ ফেরত পাব ?

সরোজ মুখ তুলে তাকায়, রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ।

ও মাসে একটু দরকার আছে।

—কথা দিতে পারছিনা সেই জন্যেই তো আংটী রেখে যাচ্ছি।

নির্ম্মল আপত্তি করে, জিনিষ বাঁধা রেখে টাকা দিতে পারব না।

সরোজ ইতস্তত করে, দিলে বড় উপকার হত।

মাপ করবেন।

আশ্চর্য্য, সরোজ আর কোন কথা না বলে হাত তুলে নমস্কার করে চলে যায়।

সেই দিনই নির্ম্মল বৌদিকে সরোজের কথা বলে। বৌদি বল্লেন, আমার কাছেও এসেছিল।

—তাই নাকি।

হাতে টাকা ছিল, দিতে গেলাম, নিলে না। সেই এক কথা, আংটি জমা দিয়ে তবে নেবে কিন্তু তুমি বল ভাই, ওকে না জিজ্ঞেস করে কোন সাহসে পরের আংটি রাখব।

—মনীশবাবু একথা শুনেছেন নাকি ?

—বলেছিলাম।

—কি বল্লেন ?

শুনে তো রেগে অস্থির। বল্লেন, ও একটা হতভাগা, বাপের পয়সা উড়িয়েছে। ওকে প্রশ্রয় দিও না। ওর জন্যেই নাকি অরুণাকে সারাতে দেরী হচ্ছে।

—কি জানি নির্ম্মল নিজের মনেই বলে, লোকটা বোধ হয় তত খারাপ নয়।

নির্ম্মলের দিনগুলো কাটছিল খুব তাড়াতাড়ি। প্রত্যেকটা সন্ধ্যেবেলা প্রায় তার আগে থেকে ঠিককরা থাকে কার বাড়ী যাবে। এরই মধ্যে যেদিন অবসর পায় চোখ কান বুজে ট্রামে উঠে চলে যায় লেকের ধারে কিংবা গড়ের মাঠে। তবু খানিকটা খোলা হাওয়া আর ফাঁকা মাঠ।

সেদিন লেক থেকে ফিরতে গড়িয়াহাটার মোড়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অনীতার সঙ্গে। দোকান থেকে কয়েকটা জিনিষ কিনে বাড়ী ফিরছিল। নমস্কার করে বল্লে, নির্ম্মলদা চলুন আমাদের বাড়ী।

তোমাদের বাড়ী তো ষ্টেশনের কাছে ?

হ্যাঁ দশ মিনিটের রাস্তা। বাবা আপনাকে দেখলে খুব খুসী হবেন।

কি করে বুঝলে ?

অনীতা মাথা দুলিয়ে বলে আমি জানি আপনিও তো বাবার মত

গম্ভীরসম্ভীর মানুষ—কথা শুনে নির্ম্মল না হেসে পারেনা। ওরা দুজনেই ট্রামে উঠে পড়ে।

নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, রঞ্জিত আজ আসবে নাকি ?

—না বোধ হয়। ওর একটা মিটিং আছে। কালও ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। দাদাকে ছাড়তে ষ্টেশনে গিয়েছিলাম কিনা—

—তোমার দাদা বাইরে থাকেন ?

—আমার পিস্তুতো দাদা, রাঁচীতে ওর ব্যবসা আছে। ক'লকাতায় শুধু আমি আর বাবা থাকি।

—মা ?

—বছর দু'য়েক হ'ল মারা গেছেন।

—ও। বাবা কি করেন ?

—এখন তো রিটায়ার্ড। আগে গভর্ণমেণ্ট কলেজেব প্রফেসব ছিলেন। ট্রাম এসে টারমিনাসে থামে। সেখান থেকে অনীতাদেব বাডী কাছেই।

অনীতার বাবা বিকাশবাবু বাইরেব ঘরে বসে ছিলেন। পরিচয় হওয়ার পর প্রসন্ন হেসে বলেন, আপনি রঞ্জিতের দাদা, খুব খুসী হলাম, দয়া করে যে এসেছেন।

নির্ম্মল লজ্জিত হয়, সে কি বলছেন ?

—রঞ্জিত ঠিক এ বাড়ীর ছেলের মত। কিন্তু ওর বাড়ীর কারুর সঙ্গেই আমার আলাপ হয়নি। একদিন বাড়ীর সকলকেই নিয়ে আসবেন।

নির্ম্মল শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

অনীতা জিজ্ঞেস করে, নির্ম্মলদা, কফি না চা, কি খাবেন বলুন।

—যেটা তোমার সুবিধে হয়।

—বাবা কফি খেতে ভালবাসেন।

—বেশ তো, তাই কর না—

অনীতা ভেতরে চলে গেলে বিকাশবাবু নির্ম্মলের সঙ্গে গল্প করেন। নানা রকম কথা, তাঁর ছোটবেলাকার স্কুল কলেজের জীবন থেকে সুরু করে কলেজের অধ্যাপনা পর্য্যন্ত। কত রকম পারিবারিক খুঁটিনাটি। নির্ম্মল অবাক হয়ে শোনে। কি প্রাণখোলা মানুষ। তার মনেই হয় না আজকেই মাত্র অনীতার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

বিকাশবাবু হঠাৎ গলাটা নীচু করে বলেন, একটা কথা বলব। অনীতাকে কিন্তু বলবেন না—

নির্ম্মল নীরবে সম্মতি জানায়।

—আমি ওর বিয়ের ঠিক করেছি।

—কোথায় ?

—আমারই এক ছাত্র। কলেজের প্রফেসর হয়েছে, বেশ ভাল ছেলে।

—অনীতা একথা জানে ?

—না। ও যা জেদী মেয়ে, বলতে সাহস হয়না। কিন্তু আমি জানি ওর বিয়েতে যত আপত্তি শুধু আমারই জন্যে।

—কেন ?

—ওর মা দু'বছর হল মারা গেছেন। জানেন তো, ও আমার একমাত্র সন্তান। সেই থেকে ও আমাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। অবশ্য সে সময় আমার শরীরটাও খারাপ হয়েছিল ডাক্তাররা বলেছিল, হার্ট উইক্। পাছে আমার কিছু হয় এই ভয়ে কলেজ যাওয়াই ছেড়ে দিল। বি. এ. পাশ করে আর পড়ল না—

—এখন বিয়ে হয়ে গেলে আপনি বা একা থাকবেন কি করে ?

বিকাশবাবু আপত্তি করেন, না, না। এখন আমি বেশ আছি। বাড়ীতে বসে বসে বাত ধরে যাচ্ছে। ঠিক করেছি বেসরকারী কলেজে

একটা চাকরি নেব। একটা কিছু নিয়ে থাকলে মনটাও ভাল থাকবে তাছাড়া আমার জন্য মেয়েটা জীবনের সেরা দিনগুলো নষ্ট করবে, এ আমিই বা কি করে সহ্য করব বলুন?

অনীতার পায়ের শব্দ শোনা যায়। বিকাশবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, ওকে কিন্তু কিছু বলবেন না। তাহলেই সব পণ্ড করে দেবে। বেশী দেরি হবে না, ওর জন্যে ছেলে আর আমার জন্য চাকরি দুটোই ঠিক করে রেখেছি।

অনীতা এসে পড়ায় সে আলোচনা বন্ধ হয়। কফি ঢালতে ঢালতে অনীতা বলে, রোববারে পিক্‌নিকের সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো?

নির্ম্মল বলে, রঞ্জিত তো বড় গাড়ীটা নেবে বলেছে, আমিও অফিসের গাড়ীটা নিয়ে আসব। তাহলেই হয়ে যাবে, কি বল?

—তা হবে, দশজনের বেশীতো লোক হবে না।

—বৌদি বলেছেন লুচি আলুর দম নিয়ে যাবেন, আর আমি নেব কেক আর প্যাটি।

অনীতা হেসে বলে, বাবা, আপনারাই তো সব নিয়ে গেলেন, আমরা আর কি নেব?

—কেন জল, হারমোনিয়াম—

—হারমোনিয়াম কি হবে?

—তোমাকে গান করতে হবে যে, বৌদির হুকুম।

এতক্ষণে বিকাশবাবু কথা বলেন, পিক্‌নিকের মস্ত আয়োজন দেখছি, সব যাবে, কোথায়?

—এখনও কিছু ঠিক হয়নি।

—এক কাজ কর, তোমাদের সঙ্গে অনিন্দ্যকান্তিকেও নিয়ে যেও। রোববার, ওরও ছুটি আছে।

অনীতা বলে, উনি প্রফেসার মানুষ, এত হৈ হৈ কি ভাল লাগবে?

—কেন লাগবে না, প্রফেসার বলে কি আমরা মানুষ নই? নিজের রসিকতায় বিকাশবাবু নিজেই হো হো করে হেসে ওঠেন!

কথায় কথায় রাত্রি হয়ে যায়। বিকাশবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নির্ম্মল বেরিয়ে আসে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনীতাকে বলে, তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগল।

অনীতা একটু ইতস্ততঃ করে বলে, আপনি বাবাকে আমার আর রঞ্জিতের বিষয়ে কিছু বলেননি তো?

—না

—ভাগ্যিস! আমি ভয় পাচ্ছিলাম। বাবাকে আমি এখনও কিছু বলিনি।

—কেন?

—বাবার হার্ট খুব উইক। আমার বিয়ে হয়ে গেলে উনি একলা থাকবেন কি করে? অথচ আমাদের বিয়ের কথা শুনলে বাবাই সুখী হবেন সব চেয়ে বেশী।

—তাহলে কি করবে ঠিক করেছ?

—কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারিনি। যতদিন না বাবার জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পারছি আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। রঞ্জিতও তাতে রাজী হয়েছে।

—সেই ভাল। নিম্মল সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

মাসীমার বাড়ী পর্য্যন্ত নির্ম্মল ভাবতে ভাবতেই চলো অনীতা আর তার বাবার কথা। দুজনেই দুজনের জন্যে কি গভীর চিন্তা করেছে অথচ কোন নিষ্পত্তি করতে পারছে না। অনীতা সম্বন্ধে নির্ম্মলের মনে আর কোন রকম কিন্তু নেই। এতদিন পর্য্যন্ত মাসীমাকে প্রাণখুলে অনীতার বিষয় বলতে পারেনি কারণ নিজেই তাকে বুঝতে পারছিল না। যদিও শোভনা বৌদি অনীতাকে দেখার পর বলেছিলেন, ঠাকুরপো, এই মেয়ের জন্যে ভাবনা? সত্যি বলছি

এত ভাল মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি, তোমার মাসীমা যদি একে বৌ করে ঘরে আনতে না চান, আমি তোমার মার মত নিয়ে তোমার জন্যে নিয়ে আসব।

নির্ম্মল বাধা দিয়ে বলে, ব্যাস্ ব্যাস আর বলতে হবে না। আমার যা বলবার মাসীমাকে বলে আসব।

তবু এর পরও নির্ম্মল মাসীমাকে কিছু বলেনি কারণ অনীতার বাড়ীর কথা সে কিছুই এতদিন জানতো না। আজ বিকাশবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সে ভাবনা আর নেই। সানি পার্কে পৌঁছে সোজাসুজি মাসীমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়।

—মাসীমা কি করছো?

মাসীমা আশ্চর্য্য না হয়ে পারেন না, ব্যাপার কি, না ডাকতেই নিজে থেকেই এসেছিস যে বড়? এম্‌নিতে তো আজকাল পালিয়ে বেড়াস্।

—আর কিছু ভাবনার নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে রঞ্জিতের বিয়েতে রাজী হতে পারো।

নির্ম্মল এতদিন অনীতার বিষয়ে যা কিছু জানতে পেরেছে সংক্ষেপে জানায়। বলে, তাছাড়া রঞ্জিত ওকে সত্যি খুব ভালবাসে।

—তাই তো দেখছি। ও আর মার্জারীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

—তবে তাই হোক, তোর মেশমশাইকে বলব'খন।

একটু পরে মাসীমা নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করেন, তোরা পিক্‌নিকে যাবি কবে?

—সামনের রোববার।

মাসীমা কি যেন বলবার জন্যে উস্‌খুস করেন। একজনকে নিয়ে গেলে ভাল হত।

—কাকে?

—মার্জারী বোস্। মাসীমা কৈফিয়তের সুরে বলেন, ওরা কাল এসেছিল। আমি কথায় কথায় বলে ফেলেছি খোকা পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করেছে। শুনেই ও আনন্দে অস্থির, তখুনি মার সঙ্গে ঠিক করতে লাগল কি শাড়ী পরে যাবে। সত্যি মেয়েটা বড় সরল।

—বেশ তো। রঞ্জিতকে বলবো।

মাসীমা খুব আশ্বস্ত হন না, দেখ, খোকা কি আর ওকে বলবে?

নির্ম্মল ভরসা দেয়, তোমায় অত ভাবতে হবে না। আমার সঙ্গে তো মার্জারীর সেরকম আলাপ নেই, নইলে আমিই বলতাম। তবে রঞ্জিত রাজী না হলে আমি অনীতাকে দিয়ে বলাবো।

—অনীতা! মাসীমার গলায় বিস্ময়ের সুর।

আজ রোববার। সকাল ন'টার সময় বেরিয়ে সন্ধ্যে করে বাড়ী ফেরার কথা। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত। কলকাতার পিক্‌নিক্, বোটানিক্যাল গার্ডেন। সাবা দুপুর সেখানে কাটাবাব পালা।

নির্ম্মল সকাল থেকে উঠেই বেরুবার তোড়জোড় করছিল। এমন সময় অরুণার মা এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেন।

—আপনি?

—একটা কথা তোমায় বলবার ছিল বাবা।

নির্ম্মল চেয়ার এগিয়ে দেয়, বসুন—

—না বসবো না। তোমাদের তো আবার বেরুবার তাড়া আছে; কিন্তু কদিন থেকে একটা কথা বলবো বলবো করে—

—কার বিষয়ে? অরুণার কিছু হয়েছে নাকি?

—না, না। ওই রাতুল ঘোষ—

—রাতুল ঘোষ! নির্ম্মল বিস্মিত হয়।

—হ্যাঁ, মনীশবাবু বলছিলেন তোমার সঙ্গে আলাপ আছে,

তাই বলছি, জানই তো লোকটা মাতাল, দুশ্চরিত্র। কিন্তু আজকাল যা সুরু করেছে তাতে আর এবাড়ীতে ভদ্রলোকের থাকা পোষায় না।

নির্ম্মল কোন কথা বলে না। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

অরুণার মা তেতো গলায় বলেন, দুদিন থেকে দেখছি রাত্রিবেলা ওর ঘরে একটি মেয়ে আসে, সকালবেলা আর দেখতে পাই না—

নির্ম্মল চম্‌কে ওঠে, সেকি?

—তাইত বল্‌ছি। ছেলেমেয়ে নিয়ে যারা ঘর সংসার করে এসব কাণ্ড দেখার পর তারা কি করে এখানে থাকবে। এর যাহোক একটা বিহিত যদি তোমারা না কর—

নির্ম্মল থামিয়ে দেয়, থাক্‌ এসব আর শুনতে ভাল লাগছে না। আমি পরে এ নিয়ে ভেবে বলব।

অরুণার মা চলে গেলেও তার কথাগুলো নির্ম্মলের মনকে বিষাক্ত করে তোলে। রাতুল ঘোষ সম্বন্ধে বিশেষ ভাল ধারণা নির্ম্মলের ছিল না। কিন্তু সে যে ক্রমে এতটা নীচে নেমে যাবে তা সে আশা করেনি।

অফিসের গ্যারেজ থেকে গাড়ী নিয়ে নির্ম্মল বাসায় ফিরে দেখে রঞ্জিতরা তারি জন্য অপেক্ষা করছে। অনীতা এগিয়ে আসে, এত দেরী করলেন যে? আমরা কখন থেকে এসে বসে আছি।

রঞ্জিত পরিচয় করিয়ে দেয়, নিরুলদা, মার্জারীকে তো তুমি চেনো আর ইনি হলেন প্রফেসার অনিন্দ্যকান্তি মিত্র—

নির্ম্মল হাততুলে প্রতি নমস্কার করে। ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, চল, চল আর দেরী নয়।

বেয়ারার হাত থেকে টিফিন কেরিয়ারটা নিয়ে নির্ম্মল গাড়ীতে উঠে বসে।

মনীশবাবু আর বৌদি এলেন সবচেয়ে দেরী করে। বৌদি বিস্কুটের টিনে খাবার পুরে ফালি দিয়ে বেঁধে এনেছেন।

নির্ম্মল ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে, মাথা গুনেছেন তো, আমরা খুব কম লোক নই।

—সে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।

অরুণা আগেই নেমে এসেছিল। পরনে ফিকে হল্‌দে শাড়ী, খোলাচুলে হল্‌দে রিবন। চোখের কোণে সুরমা কপালে·হল্‌দে রঙ্‌-এর টিপ।

মনীশবাবু বল্লেন, অরুণাকে ঠিক বনদেবীর মত দেখাচ্ছে।

অরুণা সকলের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসে। হাতের আপেল দেখিয়ে বলে, নির্ম্মলদা এটা সঙ্গে নিলাম। খিদে পেলে খাব।

গাড়ী ছাড়ল। নির্ম্মলের ছোট গাড়ীতে ছিল অনীতা আর শোভনাবৌদি।

মোড়ের মাথায় সরোজের সঙ্গে দেখা। সে পানওয়ালার দোকানে দাঁড়িয়ে ছিল। নির্ম্মল গাড়ী থামিয়ে ধরে আনে; চলুন আমাদের সঙ্গে।

—কোথায়?

—পিক্‌নিক্; বোটানিক্‌সে।

সরোজ ইতস্তত করে, না আমি আর যাব না. আপনারা বরং—

—সে হবে না। অন্য গাড়ীতে অরুণা, মনীশবাবু সবাই আছেন।

—অনেক লোক তো পেয়েছেন, মিথ্যে ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি?

শোভনা বৌদি নিজের থেকে বলেন, আপনার কথা শোনা হবে না, উঠুন গাড়ীতে।

সরোজ আর আপত্তি করতে পারল না। সামনের সিটে উঠে বসে। তারা এসে বোটানিক্‌সে পৌছল প্রায় এগারটার সময়।

প্রকৃতির মধ্যে পড়লেই অরুণার পাগলামী বেড়ে যায়। ফুল

ছিঁড়ে মাথায় গোঁজে, অযথা ছুটে দূরে চলে যায়। অকারণে চীৎকার করে হাসে।

মণীশবাবু বলেন, মানুষ প্রকৃতির জীব। সভ্যতার মুখোশ এঁটে কেউ সুখী হতে পারে না।

রঞ্জিত হেসে মন্তব্য করে, কিন্তু এমনভাবে আমাদের সমাজ গড়ে উঠেছে, মুখোশ না এঁটে আর উপায় কি বলুন, যা জানি না, ভাব দেখাতে হয় সেটাই সব চেয়ে বেশী জানি।

মণীশবাবু মাথা নাড়েন, না না। এ আমি মানতে রাজী নই। সত্য চিরদিনই স্থির, তাকেই আঁকড়ে পড়ে থাকা উচিত।

—উচিত সে তো হিতোপদেশেও লেখা আছে। বুঝতেও পারি। কিন্তু সেই মত কাজ করলে এজগতে টিক্‌বো কি করে?

শোভনা বৌদি প্রসঙ্গ পালটে দেন, এই যে আবার তর্ক সুরু হল, তার চেয়ে আসুন একটা ভাল জায়গা দেখে বসা যাক্।

অনীতা আর মার্জারী নির্ম্মলের সঙ্গে গাড়ী থেকে খাবার বয়ে আনছিল। নির্ম্মল বলে, আশ্চর্য্য, পিকনিকে বেরুলেই কিরকম খিদে পেতে সুরু করে।

—কিরকম?

—এই তো সকালবেলা গণ্ডে পিণ্ডে খেয়ে এলাম। আবার যেই খাবারের গন্ধ পাচ্ছি, অমনি মনে হচ্ছে খেতে বসলে হয়।

মার্জারী আড়ষ্ট হেসে বলে, ফর্ হেভেন্‌স্ সেক্, এসেই খেতে বসবেন না। তার চেয়ে একটু হেঁটে বেড়িয়ে এলে তো হয়।

—সে মন্দ নয়, ওদিকে অনেক ফুলগাছ আছে, খুব ভাল ভাল মৌসুমী ফুল হয়।

অরুণা মাঝখান থেকে বলে, ওধারে অনেকবার এসেছি।

মণীশবাবু লাফিয়ে ওঠেন, কোন ধারে?

—বাগানের ঐ কোণে—

—কার সঙ্গে এসেছিলে অরুণা ?

—আমার স্বামী।

মনস্তাত্ত্বিক মণীশবাবু এ সুযোগ ছাড়েন না। বলেন, চল তো, কোথায় দেখি —

গল্প করতে করতে দুজনে এগিয়ে যায়।

রঞ্জিত মন্তব্য করে, উনি আছেন ভাল, ঠিক ডিটেকটিভের মত পাগলামীর সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সরোজ স্বভাবত বেশী কথা বলেনা, দূরে দাঁড়িয়ে নোট বইতে কি সব লিখছিল।

অনীতা ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার সরোজবাবু, আমাদের সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছেন নাকি ?

অপ্রস্তুত সরোজ ব্যস্ত হয়ে বলে, না আমি ঠিক আছি, মানে শরীরটা ভাল নেই।

আর সবাই একজায়গায় বসে গল্প করলেও তাদের পরস্পরের কথার মধ্যে কোন সঙ্গতি ছিল না। শোভনা বৌদি কথার সঙ্গে কাজ করেন। বাক্স থেকে ডিশ বার করে, ঝেড়ে মুছে খাবার সাজাবার আয়োজনে ব্যস্ত। অনীতাও সাহায্য করে। মার্জারী কখন উঠে গিয়েছিল কাছেরই একটা গাছ থেকে ফুল পাড়ার জন্যে। দু'এক বার লাফিয়েও নাগাল না পেয়ে সুর করে চেঁচিয়ে বলে, কে আমাকে সাহায্য করবে ?

রঞ্জিত নির্ম্মলকে ঠেলা দেয়, যাও না নির্ম্মলদা, একটু শিভালরী দেখাও।

নির্ম্মল হাসতে হাসতে উঠে যায়। মার্জারীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, ফুলগুলো কিন্তু অনেক উঁচুতে। এতদিনের অনভ্যাসের পর অতখানি লাফাতে পারব বলে মনে হয় না।

—তাহলে ছেড়ে দিন—

নির্ম্মল রসিকতা করে, এত সহজে রেহাই পাব আশা করিনি।

সে কথায় কান না দিয়ে মার্জারী বলতে সুরু করে, চলুন বট গাছটা দেখে আসি।

—ওরা কেউ যাবে কিনা জিজ্ঞেস করি।

মার্জারী বাধা দেয়, না থাক্। এখুনি তো ফিরে আসব, তার গলায় পরিষ্কার বিরক্তির আভাস।

নির্ম্মলের তা নজর এড়ায় না, আপনার বোধহয় ভাল লাগছেনা ?

—কেন বলুন তো ?

—ইউ আর নট ইন হওর ওন সেল্ফ্—

—রিয়েলী ? আপনার যে এত কীন্ অবজারভেশান তা জানতাম না।

নির্ম্মল হাসে, জানাবার সুযোগ পেলাম কই ! দু'একটা পার্টিতে যা দেখা হয়েছে, সেখানে ভক্তবৃন্দের ব্যূহ ভেদ করে এ অধম আর আপনার কাছে এগুতে পারেনি।

মার্জারী খিল খিল করে হাসে, বেশ কথা বলেন তো আপনি, এতক্ষণ ওদের মধ্যে বসে থেকে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল—

—আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম।

—আপনিই বলুন তো নির্ম্মলবাবু, এরকম ডাল্ পিক্‌নিক কখনও দেখেছেন ? এতটুকু লাইফ্ নেই। মণীশবাবু তো নিজের মনে কোথায় চলে গেলেন, আর এক ভদ্রলোক তো সারাক্ষণ দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন—

—সরোজ ঐ রকম, ওর মাথায় ছিট্ আছে—

—কিছু মনে করবেন না, আপনাদের ঐ বৌদি পিক্‌নিকে এসেও সংসার পেতে বসেছেন, খাবার জন্যেই যদি আসা তো বাড়ীতেই খেলে হ'ত—

নির্ম্মল না হেসে পারে না, যার যা স্বভাব মিস্ বোস,—

--তাই তো বলছি, এদের নিয়ে কি পিক্‌নিকে কেউ আসে? আমি আরও আশ্চর্য্য হচ্ছি রঞ্জিতকে দেখে। ও কি ভীষণ 'জলি' ছিল, এক একটা পিক্‌নিক্ ও একলাই জমিয়ে দিয়েছে, গান বাজনার কথা ছেড়েই দিলাম, ওটাতে তো কেউ ওকে বীট করতে পারতো না কিন্তু গেম্‌সে—মার্জ্জারী হেসে ওঠে, সত্যি কি ভীষণ দুষ্টু ছিল রঞ্জিত, ভাল খেলতেও পারতো না, কিন্তু ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে এমন মজা করত, বিশেষ করে ববি আর জেলানীর সঙ্গে; ওরা পিক্‌নিকে এসেও সিরিয়াস্‌লি খেলবে। মেয়েরা তো রঞ্জিতের কাণ্ড দেখে হাসবে কি খেলবে ঠিক করতে পারত না। ববিরা রেগে রঞ্জিতের নাম দিয়েছিল লেডিস ম্যান্। আমরা কিন্তু ডাকতাম, নটি রঞ্জিত—

রঞ্জিতের কথা বলতে বলতে মার্জ্জারী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তার ফরসা গালে গোলাপী আভা দেখা দেয়, আজ অনেক দিন বাদে রঞ্জিতের সঙ্গে পিকনিকে এলাম কিন্তু ও যে অতখানি বদলে গেছে তা বুঝতে পারিনি, সত্যি নির্ম্মলবাবু, এমন জানলে আমি আসতাম না।

বটগাছের কাছটা ঘুরে মিনিট পনের বাদে তারা যখন ফিরে এলো বৌদি তখনও খাবার আগলে বসে আছেন, আর অনিন্দ্যকান্তি দূরে বসে 'পেসেন্স' খেলছে।

নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, এরা সব গেল কোথায়?

বৌদি বল্লেন, অনীতা আর রঞ্জিত জল আনতে গেছে।

--আর সরোজ?

—কেন, সে তোমাদের সঙ্গে যায়নি?

—কই না।

—আশ্চর্য্য, একটু আগে রঞ্জিত খোঁজ করছিল। আমরা ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে গেছে।

মার্জ্জারী নির্ম্মলকে জিজ্ঞেস করে, কোন রকম ম্যাগাজিন এনেছেন নাকি?

—ঐটেই মারাত্মক ভুল হ'য়ে গেছে।

অনিন্দ্যকান্তি তাসের ওপর চোখ রেখেই পকেট থেকে একটা পাতলা বই বের করে দেয়। এটা পড়ে দেখতে পারেন, কতগুলো আধুনিক ইংরিজী কবিতা।

মার্জারী ধন্যবাদ দিয়ে বইটা হাতে নেয়, বলে, পোয়েট্রি আমি খুব ভালবাসি।

—ছন্দ না ভাব, কিসের জন্যে ?

—তা ঠিক বলতে পারি না, তবে সুইনবার্ন কি টেনিসন্—

অনিন্দ্যকান্তি হাসে, তাহলে এ বইটার এক পাতাও আপনার ভাল লাগবে না—

—তবু চেষ্টা করে দেখি, মার্জারী বই নিয়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে।

নির্ম্মল অনিন্দ্যকান্তির কাছেই বসেছিল, আপনার কি সাবজেক্ট ?

—কলেজে পড়াই দর্শন কিন্তু ভালবাসি সাহিত্য।

—ইংরিজী না বাংলা ?

অনিন্দ্যকান্তি আবার হাসে, সাহিত্যের দরবারে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন এখনও সুরু হয়নি। আমারও তাই বিচার নেই। সাহিত্য হলেই হল।

অনিন্দ্যকান্তির বয়স বেশী নয়, তিরিশের কোঠা বোধ হয় সবে পেরিয়েছে। হলদে রংয়ের পাঞ্জাবি আর ধুতিতে তাকে মন্দ দেখায় না, কারণ মুখশ্রীটি ভাল। কথা প্রসঙ্গে অনীতার বাবার কথা এসে পড়ে। অনিন্দ্যকান্তি সহজগলায় বলে, বিকাশবাবুর মত খাঁটি লোক আজকাল চোখে পড়ে না। এঁদেরই বলে সত্যাশ্রয়ী।

—মনে হয় অনীতাও ওর বাবার অনেক গুণ পেয়েছে।

—বলতে পারি না, তবে ও একেবারে ছেলেমানুষ। বয়স হলে হয়ত শুধরে যাবে, একটা জিনিষের অভাব আমি ওর মধ্যে বরাবর

লক্ষ্য করছি, ধৈর্য্য। ছোটবেলা থেকে এই গুণটি শিখতে না পারলে বড হয়েও—

নির্ম্মল কথাটা লঘু করার চেষ্টা করে, তাই বুঝি এখানে এসে থেকেই পেসেন্স খেলছেন, একি আপনার ধৈর্য্যবৃদ্ধিব মহৌষধ—

সে যাই বলুন, বাজে বকবক কবার চেয়ে চুপচাপ কবে বসে থাকা ঢের ভাল। তাতে অন্য লোকের বোকামীটা সহজে চোখে পডে।

নির্ম্মল কৌতূহল প্রকাশ করে, তাহলে এতক্ষণ ধবে আমাদের কি বোকামী দেখলেন বলুন—

অনিন্দ্যকান্তি শব্দ কবে হাসে, সত্যি শুনবেন ? আপনাদেব এই মিস্ বোসটি, নিজেকে শুধু প্রচাব কবতে চান, তিনি কি বকম সুন্দরী, কতখানি পণ্ডিতা। এতেই বোঝা যায ওঁর চরিত্রে ডেপ্‌থ্ বলে কোন জিনিষ নেই, যার কিছুটা আছে অর্নাতাব মধ্যে। ঐটুকুই তাদেব মধ্যে পার্থক্য।

—তারপর ?

—অরুণাকে বোঝা মুস্কিল, কারণ ওর কথাব কোন সঙ্গতি নেই। তবে আপনাদের বৌদিটি সত্যি ভাল। এঁকে দেখলে মনে হয প্রাচীন গিন্নীদের মধ্যে যে সব ভাল গুণ ছিল তার কিছু উত্তবাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। অরুণার দাদাকে দেখলে মনে হয ওর মনে বড অশান্তি, সেইজন্যই কারুর সঙ্গে মিশতে চান না।

নির্ম্মল অবাক হয়, বলে একদিনেই আপনি এতগুলো লোককে বুঝে ফেলেছেন দেখছি। এবার অন্যদের কথা বলুন—

রঞ্জিতবাবু বেশ প্রাণখোলা লোক, ওঁর মনটা কাঁচের 'শো' কেশের মধ্যে রয়েছে, সবাই দেখতে পায়। কিন্তু মণীশবাবু ঠিক তার উল্টো, কিছু ওঁর বোঝা যায় না।

—আর আমি ?

অনিন্দ্যকান্তি সহাস্যে বলে, বুদ্ধিমান লোক, সেইজন্যেই তো এত কথা বল্লাম।

জল নিয়ে ফিরে এসে অনীতারা দেখে এরা সবাই খেতে বসে গেছে।

রঞ্জিত কাগজের বাক্স থেকে একটা পেষ্ট্রী তুলে নিয়ে অনুযোগ করে, বাঃ এরই মধ্যে সুরু করে দেওয়া হয়েছে।

বৌদি হেসে ফেলেন, তোমরা এতো তাড়াতাড়ি ফিরবে তাতো ভাবিনি—

—তার মানে?

—ভেবেছিলাম বাড়ী ফেরার আগে তোমাদের চারদিকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

—নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, তোমরা সরোজকে দেখেছ?

—না, কোথায় গেলেন দেখতে পাচ্ছি না তো।

অনিন্দ্যকান্তি মাঝখান থেকে বলে, একবার যেন বলছিলেন ষ্টীমার দেখতে যাবেন গঙ্গার ধারে—

—মণীশবাবুরাও তো এখনও ফেরেন নি।

বৌদি বলেন, ওঁর জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই। যতক্ষণ না কৌতূহল মিটবে, উনি ফিরবেন না।

কথাটা মিথ্যে নয়, মণীশবাবু অরুণাকে নিয়ে ফিরলেন আরও প্রায় আধঘণ্টা বাদে, তাঁর মুখে সাফল্যের হাসি। অরুণা বৌদির পাশে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে—উঃ অনেক হেঁটেছি।

বৌদি হাসেন, কেন যেতে গেলি ওঁর সঙ্গে।

—সব জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সেই বেঞ্চীটা, সেই গোল-পাতার ঘর। আজ ও যদি থাকত আমাদের সঙ্গে।

মণীশবাবু নির্ম্মলকে গোপনে বলেন, অরুণাকে সারাতে যদি না-ও পারি অন্তত বলে দিতে পারব কেন সে পাগল হ'য়েছিল।

সরোজ তখনও ফেরেনি, অরুণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, দাদা কোথায়?

বৌদি উত্তর দিলেন, কোথায় যে গেল ষ্টীমার দেখতে।

মার্জারী মন্তব্য করে, ষ্টীমার দেখতে গিয়ে তাতে চড়ে বসেন নি তো? তাহলে একেবারে ওপারে গিয়ে নামবেন।

অরুণা রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। দাদাকে আপনারা তাড়িয়ে দিয়েছেন। কথাটা এত কর্কশ, সকলের কানে লাগে। মণীশবাবু ধমক দেন, কি বাজে বকছ—

—নিশ্চয় আপনি এদের শিখিয়ে দিয়েছেন দাদাকে তাড়িয়ে দিতে—

—আঃ, চুপ করো।

অরুণা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

পিকনিক শেষ করে বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। নির্ম্মল মনে মনে ঠিক করেছিল বাড়ী গিয়ে লম্বা ঘুম দেবে, আজ আর সানিপার্কে যাবে না। পরদিন অফিসে যেতে হবে একটু তাড়াতাড়ি, কতগুলো জরুরী কাজ আছে, কিন্তু বাড়ী ফিরতেই বেয়ারা জানাল, ঘোষ সাহেবের বেয়ারা তিনবার ঘুরে গেছে। রাতুল ঘোষ সম্বন্ধে অরুণার মার কথাগুলো মনে পড়ে যাওয়ায় নির্ম্মল বিরক্ত না হয়ে পারে না।

—কেন?

—সাহেবের অসুখ।

নির্ম্মল এ উত্তর আশা করেনি, তাই নাকি?

—দু'তিন দিন থেকেই জ্বর, আজ নাকি বাড়াবাড়ি হয়েছে।

নির্ম্মল জামা কাপড় বদলে রাতুল ঘোষের ঘরে এসে হাজির হয়। রাতুল ঘোষের চাকর তাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আপনি এসে-গেছেন, বাঁচলাম। সাহেবের এইরকম জ্বর, মাঝে মাঝে বেঁহুশ হয়ে

যাচ্ছেন। আমি তো ভয়ে মরি। আর তো দ্বিতীয় লোক নেই যে একমিনিট বসিয়ে রেখে কাউকে খবর দেব।

নির্ম্মল রাতুল ঘোষের খাটের কাছে এগিয়ে যায়। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে পাহাড়ের মত পড়ে আছে তার শরীরটা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। নির্ম্মল কপালে হাত দিয়ে দেখে খুব জ্বর, মৃদুকণ্ঠে নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, ডাক্তার কি বলছেন ?

বেয়ারা উত্তর দেয়, ম্যালেরিয়া ?

—বেশী জ্বর হলে মাথায় বরফ দিতে বলেননি ?

—অন্যদিন তো এত জ্বর হয়নি। আপনি যদি আধঘণ্টা বসেন আমি একবার রোহিণীবাবুর বাড়ীতে খবর দিই। গাড়ী নিয়ে যাব আর আসব আধঘণ্টার বেশী লাগবে না—

—যাও, আমি আছি।

বেয়ারা চলে গেলে নির্ম্মল ঘরের কোণে রাখা একটা চেয়ারে গিয়ে বসে। স্বল্প আলোকিত নিস্তব্ধ ঘরে শুধু রাতুল ঘোষের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। নির্ম্মলের মনে চিরন্তন দার্শনিক চিন্তা। এই তো রাতুল ঘোষ মড়ার মত নির্জীব পড়ে রয়েছে অথচ জীবনটাকে উপভোগ করার কত লোভ। এর জন্যে সে চরিত্র বিসর্জ্জন দিয়েছে, অকপটে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। এত করেও কি সে মনে শান্তি পেয়েছে, আর শান্তিই যদি না রইল, জীবন ধারণে লাভ কি ? আজ এখুনি রাতুল ঘোষ মারা গেলে পৃথিবীতে কার কি এসে যায় ? তার জন্যে দুফোঁটা চোখের জল ফেলারও বোধ হয় কেউ নেই। অসার, মূল্যহীন জীবন, এতদিন নিজের অহমিকার জোরে দম্ভভরে পা ফেলে বেড়াত।

নির্ম্মলের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায়, রাতুল ঘোষ বিকারের ঝোঁকে কি যেন বিড় বিড় করে বকছে। নির্ম্মল কান পেতে শোনে, সুজিত, সুনীল, রোহিণী, নির্ম্মল—অনেকের নামই সে উচ্চারণ করছে, কিন্তু

সবচেয়ে বেশী যার কথা সে ঘুরে ফিরে বলছে সে হোল মালতী।

মালতী কে? নির্ম্মলের চকিতে মনে পড়ে যায় সুজিতদের মাকে। এ ছাড়া আর কে হবে মালতী, সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায় নির্ম্মলের সামনে। মালতী রাতুল ঘোষের বোন নয় তা সে নিজের মুখেই গাড়ীতে বলেছিল। মালতীর স্বামী রোহিণী অসুস্থ। সেই সুযোগে রাতুল ঘোষের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে মালতীর ওপর। অরুণার মা যার কথা বলেছিলেন, সেই রাত্রের অভিসারিকা হয়ত মালতী। ঘেন্নায় নির্ম্মলের মন তেঁতো হয়ে যায়।

ঠিক এমনি সময় ঘরে ঢুকলেন সুজিতের মা। মাথায় ঘোমটা দেওয়া, গায়ে ছোট শাল জড়ানো। নিঃশব্দে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে রাতুল ঘোষের কপালে মুখে হাত বুলিয়ে দেন। বেয়ারাকে বল্লেন, যা তো রে যদু, বরফকল থেকে ঠাণ্ডা জল আর বরফ নিয়ে আয়। ভদ্রমহিলা সযত্নে রাতুল ঘোষের গায়ে একটি কম্বল চাপিয়ে দেন। আইস্ ব্যাগ, জল পটির কাপড় ও যাবতীয় সরঞ্জাম হাতের কাছে এনে রাখেন। এতক্ষণে তাঁর নির্ম্মলের সঙ্গে কথা বলার ফুরসত হয়।

—নির্ম্মলবাবু, আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব।

নির্ম্মল মুখ নীচু করেই বলে, এ তো আমার কর্ত্তব্য—

—আপনি ছাড়া এ ম্যান্শনে আর কারুর সঙ্গেই যে ওঁর ভাব নেই। তাই যদুকে বলে দিয়েছিলাম, বিপদে আপদে যেন আপনার কাছেই ছুটে যায়।

নির্ম্মল লক্ষ্য করে ভদ্রমহিলার কথাগুলি বেশ মোলায়েম, প্রত্যেকটি আন্তরিকতায় ভরা। যদু বরফ নিয়ে এলে তা আইস্ ব্যাগে ভরে রাতুল ঘোষের মাথায় দিয়ে বলেন, যদু এখানটায় বোস্তো, আমি নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে দু'টো দরকারী কথা সেরে নিই।

তারা এসে পাশের ঘরে বসে।

--আমার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও আমার ছেলেদের আপনি চেনেন।

—হ্যাঁ। সুজিত আর সুনীলের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, বেশ ছেলে।

—ওদের মুখে আপনার কথা খুব শুনি।

নির্মল নিজের থেকে বলে, রাতুল বাবুর খুব জ্বর মনে হল, মাঝে মাঝে ভুল বকছেন—

ভদ্রমহিলা সহজ গলায় বলেন, বিশ্রী ম্যালেরিয়া। জ্বর একশ' ছয় পর্য্যন্ত ওঠে। এ ওঁর ছা'পোষা রোগ—

—তার মানে?

—আরাকানে রাস্তা তৈরীর কণ্ট্রাক্ট নিযে একবার গিযেছিলেন। সেইখানেই এই বাঘা ম্যালেরিয়া ধরে, প্রায় প্রত্যেক বছরই একবার না একবার জ্বর হচ্ছে—

—আমি প্রথমটা ভয় পেযে গিযেছিলাম—

—আমার দেখে দেখে সযে গেছে। জ্বর বাড়লে মাথায জল দেওযা ছাড়া আর কিছু করবার উপায নেই। তবে একজনকে কাছে থাকতে হয়, চাকরটা আবার খুব বেশী দিনের পুরোন নয়—

—তাহলে একজন নার্স রাখা উচিত।

ভদ্রমহিলা হাসেন, সে উনি পছন্দ করেন না। দরকার পড়লে আমিই থাকি।

কথা শুনে নির্ম্মল নিজের অজান্তে লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করে। ভদ্রমহিলার দৃষ্টি এড়ায় না। নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আশ্চর্য্য হচ্ছেন, না? একটু থেমে বলেন, আপনার সঙ্গে আজ আমার এমন পরিস্থিতির মধ্যে আলাপ হ'ল যে আমার জীবনের খুব একটা গোপনীয় কথা জানাতেই হবে।

—কেন?

—তা না হলে আপনি আমাদের ভীষণ রকম ভুল বুঝবেন। যদিও একথা কাউকে জানাবার প্রয়োজন নেই জেনেই এতদিন বলিনি—

নির্ম্মল বাধা দিয়ে বলে, নাই বল্লেন, পরে বরং—

—না, আজকেই শুনে যান, উনি আমার স্বামী।

নির্ম্মল চমকে ওঠে, কে, রাতুল ঘোষ ?

হ্যাঁ, কিন্তু কথা দিন কাউকে একথা বলবেন না এমন কি ওঁকেও না।

নির্ম্মল যন্ত্র চালিতের মত সম্মতি জানায়।

আর একটা অনুরোধ, সকালে অফিস যাবার আগে এঁর একবার খবর নেবেন আমি এখান থেকে ভোর বেলা চলে যাই কি না—

সারা রাত্রি নির্ম্মলের ভাল করে ঘুম হয় না। এতদিন রাতুল ঘোষ স্বম্বন্ধে সে যে ধারণা পোষণ করেছে তা ভদ্রমহিলার একটি কথায় সম্পূর্ণ বদলে গেল। তবু এখানেই তো সমস্যার শেষ নয়, যদি তারা বিবাহিত স্বামী স্ত্রী তবে একসঙ্গে থাকে না কেন ? এত লুকোচুরির কি দরকার ?

এদের কথা আরও বেশী করে জানার জন্যে নির্ম্মলের মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

পরদিন থেকে নির্ম্মল অফিসের সময় ছাড়া সকাল বিকাল যতটা পারে রাতুল ঘোষের কাছেই কাটায়। কখনও মাথায় বরফ দিয়ে কখনও গল্প করে, ভাল হয়ে উঠলে তাস খেলে, নির্ম্মল ক্রমশ এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। রাতুল ঘোষ নির্ম্মলের পিঠ চাপড়ে বলে, আমার যে কেউ সত্যিকারের বন্ধু হ'তে পারে তা ধারণা ছিল না।

—একথা কেন বলছেন ?

পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে তো কেউ হয়নি। সেই জন্যেই তো একদিন আপনাকে বলেছিলাম, বোতলই আমার একমাত্র বন্ধু।

আপনাকে দেখে এখন মনে হচ্ছে মানুষও বন্ধু হয়, তবে সে সত্যিকারের মানুষ হলে।

নির্ম্মল লজ্জিত হয়।

—মালতীও আপনার খুব সুখ্যাতি করছিল।

—সুখ্যাতি তো ওঁরই প্রাপ্য কি অক্লান্ত সেবা—

—রাতুল ঘোষ চোখ দুটো ছোট করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়, আমি তো ওকে বলি 'ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল'।

মেয়েদের যে এটা কত বড় গুণ, আপন পরের প্রভেদ যার কাছে নেই।

—পর কেন বলছেন?

রাতুল ঘোষ উদাস কণ্ঠে বলে, মালতীর 'সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্ক নেই'।

নির্ম্মল আশ্চর্য্য হয়, কি বলছেন?

—কেন বিশ্বাস হ'চ্ছে না? একদিন হয়ত ছিল, এখন তো আর তার জের টানা যায় না—

নির্ম্মল বোঝে রাতুল ঘোষ আর এ বিষয় কথা বলতে চায় না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্ম্মল অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, ডাক্তার বাবুরা বলছিলেন আর আমারও মনে হয়, কিছুদিনের জন্যে আপনার চেঞ্জে যাওয়া উচিত।

—তা কি করে হয়, এখানকার কাজকর্ম্ম অনেকদিন দেখিনি। কর্ম্মচারীদের উপর বিশ্বাস করে তো আর ছেড়ে রাখা যায় না।

—এতদিন যখন পারলেন আর কদিনে কি এসে যাবে। তাছাড়া শুনলাম প্রত্যেক বছরই আপনার এই সময় জ্বর আসছে। বেশ কিছুদিন চেঞ্জে থেকে সারিয়ে ফেলা ভাল।

রাতুল ঘোষ ম্লান হাসে! আপনি ভুল করছেন নির্ম্মলবাবু। চেঞ্জটা বেশী দরকার মনের। আমার এই ঝিমিয়ে পড়া একলা মনটাকে

কি করে সারিয়ে তুলবো বলুন তো। এখানে তবু আপনারা আছেন, কথা বলে বাঁচি।

সুজিত সুনীলরা আসে, তারা যে আমার কতখানি—

রাতুল ঘোষ কথা শেষ না করেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

নির্ম্মল মনে মনে বোঝে রাতুল ঘোষ মালতী আর রোহিণী বাবুকে কেন্দ্র করে যে রহস্যই থাকুকনা কেন, সুজিত আর সুনীলকে নিয়ে এদে মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা সত্যই মধুর। এখানে সামাজিক বন্ধনের ত্রুটি বিচ্যুতির কোন কালিমাই স্পর্শ করেনা।

নির্ম্মল বোঝে রাতুল ঘোষকে চেঞ্জে পাঠাতে হলে সুজিতদের সবাই-কেই সঙ্গে যেতে হবে, তা না হলে একদিনও সে থাকতে পারবে না।

একদিনই নির্ম্মলের শুতে আসতে বেশ দেরি হয়। রোজ সন্ধ্যেবেলা রাতুল ঘোষ-এর কাছে যায় বলে মাসীমার বাড়ী খেতে যাওয়ার পাট একরকম বন্ধ, সে কথা অবশ্য মাসীমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল।

আজও রাত করেই নির্ম্মল বাড়ী ঢোকে। সারাদিনের খাটনির পর শরীরে মনে বিশ্রী অবসাদ। ঘরে আলো জ্বলছে। আশ্চর্য্য, চেয়ারে মণীশবাবু বসে আছেন। নির্ম্মলকে দেখেই লাফিয়ে ওঠেন্ এত দেরি যে?

—রাতুল ঘোষের শরীর খারাপ, ওরই কাছে বসেছিলাম। কিন্তু আপনি এত রাত্রে।

—আপনার জন্যে বসে আছি। অরুণাদের ঘরে চলুন—

নির্ম্মল ভয় পায়, এত রাত্রে, কেন কি হয়েছে?

ব্যাপার অনেক কিছু। অরুণার দাদা সরোজ মদ খেয়ে বাড়ীর মধ্যে মাতলামী সুরু করেছে খবর পেয়ে আমি ছুটে এসেছি।

—তা আমরা কি করব।

—বাঁদরটাকে আজই বাড়ী থেকে দূর করে দিতে হবে।

নির্ম্মল আস্তে আস্তে বলে, ওদের পারিবারিক ব্যাপারে মাথা গলানো কি উচিত হবে?

মণীশবাবু রেগে যান, তাই বলে দুটি অসহায়া নারীকে একটা মাতালের কাছে—

—মাতাল হলেও সরোজ অরুণার দাদা—

সে যাই হোক, লোকটা ইতর।

কিন্তু এ অভ্যাস তো ওর আগে ছিলনা। নির্ম্মল থেমে থেমে বলে।

মণীশবাবু দাঁতে দাঁত ঘষেন, ও একটা স্কাউণ্ড্রেল, গোড়া থেকেই লোকটাকে সুবিধের মনে হয়নি। যা রোজগার করে একটা পয়সাও মা বোনকে দেয় না, শুধু নিজে ফুর্ত্তি করে।

—তা হলে অরুণাদের চলে কি করে?

—দূর সম্পর্কের এক বড়লোক পিসীমা আছেন উনি বুঝি মাঝে মাঝে কিছু টাকা সাহায্য করেন। তাও তো ক'মাসের বাড়ীভাড়া বাকী। ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীও কানেক্‌শান্ কেটে দিয়ে যাবে বলেছে।

একে মেজাজ ভাল ছিল না। তার ওপর এই সব শুনে নির্ম্মল আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। মণীশবাবুর সঙ্গে সোজা অরুণাদের ফ্ল্যাটে চলে আসে। ভেতরে ঢুকেই চোখে পড়ল, সরোজ মত্ত অবস্থায় একটা বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। বলছে খোল দরজা, নাহলে ভেঙ্গে ফেলব। আমি শেষ বোঝা পড়া করে যেতে চাই, কথা জড়িয়ে আসছে। বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে মেয়েদের কান্নার আওয়াজ।

নির্ম্মলের পক্ষে এ অসহ্য। সার্টের কলার ধরে সরোজকে মেঝেতে পেড়ে ফেলে, বলে বেরিয়ে যাও, এ বাড়ী থেকে।

সরোজ হতবাক হ'যে বসে পড়ে, নির্ম্মলের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হাসি হাসে।

—আপনিও তাহলে আছেন এর মধ্যে ?

—কি বলছ ?

—বুঝতে পারছেন না, ন্যাকা সাজছেন ?

ভদ্রলোকের বাড়ীতে মাতলামী করতে এসেছ, আর জায়গা পাওনি ?

—আপনারাই আমাকে মাতাল করেছেন—

মণীশবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, তুমি একটি জানোয়ার।

সরোজ বিষ ওগরানো গলায় বলে, তুমি যে কেউটে সাপ।

—আঃ শাট্ আপ্, চুপকরো।

—কেন আমি চুপ করবো, ছোটলোকের বেহদ্দ, ইল্লুতে শূয়োর—

নির্ম্মল আর প্রশ্রয় দেয় না। সরোজকে সজোরে চড় মারে, সরোজ ভয়ে কুঁকড়ে যায়, ভ্যাবলা চোখে তাকায়, ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে। ততক্ষণে অরুণা মার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। দুজনেই ভয়ে জড়সড়, মণীশবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন, বলেছিলাম বদসঙ্গে মিশছে, সরোজকে বিদায় করুন, তখন করলেন না। এখন এইসব কেলেঙ্কারী—

কথা শেষ হতে পায় না। অরুণার মা মুখে আঁচল চেপে কেঁদে ওঠেন। অরুণা পায়ে পায়ে সরোজের দিকে এগিয়ে যায়। মণীশবাবু টেনে সরিয়ে আনেন। মাতালটার কাছে আর যেতে হবে না।

সরোজ নিজেকে সামলে নেয়। অরুণার দিকে ফিরে তাকিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বলে, নিজের মনেই হাসে, বিনা ভূমিকায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সম্পূর্ণ নাটকীয় পরিস্থিতি। সবাই দরজার দিকে চেয়ে আছে, সিঁড়িতে সরোজের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। এক একজনের মুখের ওপর দিয়ে নির্ম্মলের দৃষ্টি সরে যায়। ব্যথায় ভরা অরুণার চোখ।

নিজেকে সংযত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তার মা। তীব্র দৃষ্টি মণীশবাবুর চোখে। নির্ম্মল কোন কথা বলতে পারে না। সকলের কাছেই নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।

সরোজ আর ফেরেনি। দিন দুয়েক বাদে এসে দুপুর বেলা তার জিনিষ-পত্রগুলো নিয়ে গেছে। মা আর কান্নাকাটি করেন না। শুক্‌নো গলায় বলেন, সবই অদৃষ্ট, তা না হলে আর এমন হবে কেন? আগের জন্মের পাপের ফল। অরুণার কিন্তু দাদার কথা উঠলেই চোখ ছল ছল করে। মণীশবাবু খুসী, বলেন, ভাগ্যিস নির্ম্মল সেদিন মেরেছিল নইলে ক্রমশ বাঁদরামী বেড়ে যেত।

অরুণার কথা যারা শোনে সকলেরই করুণা হয় এই অল্পবয়সী মেয়েটার জন্যে।

বৃদ্ধেরা বলেন, আহা মেয়েটির মায়ের কি কষ্ট।

প্রৌঢ়রা বলেন, এর জন্যে দায়ী ওর বাপ মা।

যুবকেরা বলে, অরুণা যেন কোন গল্পের ছেঁড়া পাতা। আগে কি ঘটেছিল, পরে কি ঘটবে জানা নেই।

ছোট ছেলেমেয়েরা ভয় পায়, বলে ঘুট ঘুট করে পাগলী আসছে, এখুনি ধরে ঝোলায় পুরবে।

তবু এর মধ্যে অরুণাকে ভাল লেগেছিল একদিন, যেদিন সে সেজেগুজে এসে হাজির। পরনে তার পুরোন হলেও দামী শাড়ী, এলো খোঁপায় সাদা ফুলের মালা জড়ানো, ভাষাহীন চোখের কোণে কালো কাজল।

বিনা ভূমিকায় নির্ম্মলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে কেমন লাগছে নির্ম্মলদা?

—খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। কোথাও যাচ্ছ নাকি?

অরুণা একেবারে নির্ম্মলের সামনে এসে দাঁড়ায়, আজকে কত তারিখ জানেন ?

—বিশ তারিখ।

—আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল, অথচ আজ সে কোথায় ?

—নির্ম্মল কোন উত্তর দেয়না। অরুণা বলে যায়, কত করে বল্লাম তবু খুঁজে দিলেন না তো। আর যে একা থাকতে ভাল লাগে না নির্ম্মলদা। নির্ম্মলের হাতের উপর হাত রেখে বলে, আমি আপনার দাসী হয়ে থাকব, দোহাই তাকে খুঁজে দিন—

—আমি তো কথা দিয়েছি তাকে পেলেই ধরে আনব।

—কেউ আমার কথা শোনে না, আমার যে আপনার বলতে কেউ নেই।

.অরুণা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে যায়।

একই রকম দিন কাটতে থাকে, বৈচিত্র্যহীন জীবন। অরুণার পাগলামি, নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে খুঁজে আনার জন্য সকলকে অনুরোধ, মণীশবাবুর অবিরাম চেষ্টা অরুণাকে সুস্থ করে তোলার, বৌদির বোনা আর অরুণার মার অসহায় কান্না, এর আর বিরাম নেই।

নির্ম্মল কিন্তু তার কাজে সফল হয়েছে। রাতুল ঘোষকে রাজী করিয়ে সুজিতের মা, বাবা সবাই-এর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে গিরিডীর্তে। রাতুল ঘোষকে মাঝে মাঝে ব্যবসা উপলক্ষে ওখানে যেতে হত ; গিরিডী তার অজানা জায়গা নয়। তাই সহজে চিঠি লিখে বাড়ীর বন্দোবস্ত করতে পারল। সেই সঙ্গে যাবতীয় সরঞ্জামের। যাবার দিন রাতুল ঘোষ নির্ম্মলকে একান্তে ডেকে বলে, আপনার দৌলতে সত্যিকারের চেঞ্জ হল। আমার জীবনে এতখানি পরিবর্ত্তন আশা করিনি। ঘণ্টা পড়ার পর ট্রেনের জানালা থেকে মুখ বার করে মালতী

বলেছিল, সময় পেলে চিঠি দেবেন। আপনার কথা এ জীবনে ভুলব না।

চোখেমুখে তার কৃতজ্ঞতার ছাপ, নির্ম্মলের তা নজর এড়ায় না। সুজিত আর সুনীলকে নিয়ে আর এক বেঞ্চিতে বসেছিলেন—রোহিণী-বাবু। রোগা ফ্যাকাসে শরীর। নির্ম্মলকে হাত তুলে নমস্কার করলেন। নির্ম্মল যদিও তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পায়নি। তবু দেখেই মনে হয়েছিল শান্তিপ্রিয় মানুষ।

ট্রেণ চলে গেলে নির্ম্মলের কেমন যেন, একলা মনে হয়। এ'কদিনের মধ্যেই এদের সঙ্গে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সামান্য হলেও এদের সাহায্য করতে পেরেছে বলে নির্ম্মল মনে মনে খুশী হয়।

নির্ম্মল ঠিকই করেছিল কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বহরমপুরে যাবে। কারণ সুবিমল চিঠিতে জানিয়েছে, মার শরীর এখনও সুস্থ হয় নি তাছাড়া ওখানকার বিষয় সম্পত্তিরও কিছু বিলি ব্যবস্থা করার প্রযোজন। নির্ম্মলের উপস্থিত থাকা দরকার। এ'কদিন রাতুল ঘোষদের নিয়ে নির্ম্মল এত ব্যস্ত ছিল যে মাসীমার বাড়ী যাবারও ফুরসৎ পায় নি। তাই এদের ট্রেণে চড়িয়ে দিয়ে সে সোজা গেল সানি পার্কে।

সবকথা শুনে মাসীমা জিজ্ঞেস করেন, তাহলে কালকেই যাচ্ছিস?

হ্যাঁ, শনিবার আছে। অফিস থেকে বেরিয়েই ট্রেণ ধরব।

—ক'দিনের ছুটি নিযেছিস?

—দিন সাতেক। রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা হলনা ওকে বোল ফিরে এসে দেখা হবে।

মাসীমা একটু অন্য মনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে রঞ্জিতের সঙ্গে তোর এর মধ্যে দেখা হয়েছে?

—না, কেন বলোতো?

—কি জানি। মাসীমা থেমে যান, আজকাল যে ওর কি হয়েছে।

সারাক্ষণই তো প্রায় অফিসে থাকে। বেড়াতেও বেরোয় না, কারুর সঙ্গে বেশী কথাও বলে না।

নির্ম্মল সহজ গলায় বলে, নিশ্চয় অফিসের কাজ বেড়েছে। এ নিয়ে ভাবনার কি আছে?

—কি জানি অনীতাকেও আর দেখিনা। শুনলাম শরীর খারাপ হয়েছে। তার কথাও বেশী বলেনা। বল্লাম ওদের বাড়ীতে আমায় একবার নিয়ে চল্, গেল না।

নিবারণ সোম সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন। মাসীমাকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করেন, নির্ম্মলের সঙ্গে কি পরামর্শ হচ্ছে? আশা করি আমার বিরুদ্ধে কিছু নয়।

মাসীমা কোন উত্তর দেন না।

—কি ছেলের বিয়ে নাকি? জান নির্ম্মল, আমাদের সোসাইটিতে চিরকাল শুনেছি বাপ মা মেয়ের বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়। কিন্তু তোমার মাসীমার মত কারুর পুত্রদায় হয় জানা ছিল না—

মাসীমা চটে যান, তুমি থামবে।

—কি মুস্কিল, আমার কি কথা বলার অধিকার নেই? রঞ্জিত বড় হয়েছে এখন সব কিছু ওর নিজের দায়িত্ব। লেখা পড়া শিখিয়ে চাকরী করে দিয়েছি আমাদের আর কোন ডিউটি নেই। নির্ম্মল তুমি আমার সঙ্গে একমত কিনা?

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি সায় দেয়, সে তো নিশ্চয়।

নিবারণ সোম মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বলেন, যৌবনে ছেলেদের পৌরুষ দুটো জিনিষের মধ্যে প্রকাশ পায়। একনম্বর হল গোঁফ রাখা নিয়ে, বছরের মধ্যে সাতবার কামায়, সাতবার রাখে। আর দু'নম্বর হোল জীবন সঙ্গিনী বাছায়। পাঁচটা মেয়েকে ঘোল খাইয়ে এমন একজনকে বিয়ে করে যার কাছে নিজেই সারা জীবন ঘোল খায়। একথা তোমার মাসীমাও স্বীকার করবেন।

মাসীমার আর সহ্য হয় না, যত বুড়ো হচ্ছ তত তোমার রসিকতা বাড়ছে। আমি নির্ম্মলকে নিয়ে খাবার টেবিলে যাচ্ছি তুমি তাড়াতাড়ি এস।

এক সপ্তাহের জন্যে বহরমপুরে গিয়ে নির্ম্মল আটকে গেল প্রায় পঁচিশ দিন। মার শরীর সত্যিই ভাল ছিল না। নির্ম্মল এসে না পড়লে পুরোপুরি চিকিৎসা করানোর মুস্কিল হত। ডাক্তাদের অর্দ্ধেক কথাই তিনি শুনতেন না। নির্ম্মল এসে সময় মত ওষুধ খাইয়েছে, সব রকমের পথ্যি করিয়েছে এমন কি ইন্‌জেক্‌শান দিতেও রাজী করিয়েছে।

সুবিমল বলে, মা যদি আমাদের একটা কথাও শোনে। যা বলি, তাইতেই না—

খুকি মুচকি হাসে, আসল কথা দাদাকে দেখার জন্যে মার অসুখ। সারাক্ষণ তোমার কথা ভাববেন আর জিজ্ঞেস করলেই বলবেন, না কিছু ভাবছি না তো।

নির্ম্মল সস্নেহে মার কপালে হাত বুলিয়ে দেয় বলে, আর কি, এক দিকের ব্যবস্থা তো সব করে ফেল্লাম। চল এবার কলকাতায়, দেখবে কদিনেই শরীর মন সব ভাল হয়ে উঠবে।

মা ম্লান হেসে বলেন, এখনতো যেতেই হবে রে বিয়ের হাঙ্গামা তো সোজা নয়। মাধুরীর বাবা তো লিখেছেন ফাল্গুন মাসেই ব্যবস্থা করতে।

খুকি চট্ করে বলে, দেখ মা, দাদার বিয়ে যেন কলকাতায় না হয়। আমি সব বন্ধুদের বলেছি এখানে খাওয়া হবে—

না, কলকাতায় হওয়াই সুবিধে। মেয়ের বাড়ীও ওখানে তা ছাড়া বাজার হাট সব কিছুরই—নির্ম্মল বোঝে, শুধু, এই কারণই নয়। বাবার মৃত্যুর পর এ বাড়ী যে যে রকম ঝিমিয়ে পড়েছে সেখানে আর উৎসবের আয়োজন করে মা চোখের জল ফেলতে চান না।

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি বলে, তোমার যা ইচ্ছে সেই রকমই হবে। খুকি ঠোঁট ওলটায়, তোমার ফ্লাটে তো মাত্র তিনখানা ঘর, লোকজন খাওয়াবে কোথায় শুনি ?

নির্ম্মল খুকির মাথাটা নেড়ে দেয়, সে নিয়ে ,তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার বিয়েতে সবাই জায়গা ছেড়ে দেবে। বৌদি, অরুণারা, রাতুল ঘোষ—

মা বাধা দেন, তারই বা দরকার কি। তোর মাসী তো সব চিঠিতেই লিখছে বিয়ে যেন ওদের বাড়ী থেকেই হয়। খুকি মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করে. হ্যাঁ দাদা, মাসীমাদের খুব বড় বাড়ী, না? রঞ্জিতদা একটা ছবি পাঠিয়ে ছিল।

নির্ম্মল সারক্ষণই বসে ভাইবোনদের সঙ্গে গল্প করে বেশী করে কলকাতার কথা। তবে এরই মধ্যে সে বিষয় সম্পত্তির সব রকম বিলি ব্যবস্থা করে ফেলেছে, যাতে নিম্মল কলকাতায ফিরে গেলে সুবিমলের বুঝতে না অসুবিধা হয়।

কলকাতার খবর মাঝে মাঝে পায়, বিশেষ করে বৌদির চিঠিতে। উনি লিখেছেন নির্ম্মল চলে আসার পর থেকেই অরুণা কেমন যেন আনমনা হয়ে থাকে, হঠাৎ ডাকলে চম্‌কে ওঠে। যার তার সঙ্গে ঝগড়া করে। মণীশ বাবুর দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাবার কথা আছে। আর একটা খবর বৌদি জানিয়েছেন, অনীতা আর অনিন্দ্যকান্তি নির্ম্মলের খোঁজে একদিন এসেছিল, বলে গেছে নির্ম্মল ফিরে এলে যেন দেখা করে।

আর ক'দিন বাদেই তো কলকাতায় ফেরা। নির্ম্মল ভাবে সেখানে গিয়ে এদের সঙ্গে তো দেখা হবেই, তাই আর চিঠি পত্র বিশেষ লেখেনি। এমনকি বৌদির চিঠিরও উত্তর সময় মত দেয়নি।

বহরমপুর থেকে ফেরার আগের দিন নির্ম্মল এক অপ্রত্যাশিত চিঠি পেল গিরিডী থেকে। কলকাতা থেকে ঠিকানা বদলে

এসেছে। লিখেছে মালতী, সামান্য ক'পাতার চিঠি। কিন্তু কি বিচিত্র ইতিহাস!

প্রিয় নির্ম্মলবাবু,

আপনার কথা আজ বারবার মনে পড়ছে, তাই চিঠি লিখতে বসলাম। একটু আগেই আমরা তিনজনে মিলে তাস খেলছিলাম, এ জীবনে এই প্রথম। যাঁর সহায়তায় এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে তাঁকে স্মরণ না করে পারছি না।

নির্ম্মলবাবু, জানিনা আমার উপর আপনার কি ধারণা। মোটেও মনে করবেন না আপনার সহানুভূতি পাবার জন্যে এই চিঠি লিখতে বসেছি। আপনাকে আপন জন বলে জেনেছি বলেই যে কথা এত দিন কাউকে বলিনি তা অকপটে জানাতে পারছি।

খুব ছোট বেলায় মন সঁপেছিলাম একজনের কাছে, মনে করুন তার নাম 'ক'। তখন আমার বয়স বছর দশেক হবে। সে ছিল অদ্ভুত ধরণের ছেলে। বাড়ীতে ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা না থাকলেও সে ছুটে যেত সকলের বিপদে সাহায্য করতে। সেই বয়স থেকেই তার মধ্যে যে উদার মনের পরিচয় পেয়েছিলাম তা আজকাল আর সহজে চোখে পড়ে না।

দু'জনে বড় হলাম, তবু আমাদের মনের পরিবর্ত্তন হ'ল না। ক্রমে জানাজানি হয়ে গেল। মা বাবাও জানলেন। কিন্তু ছেলের অবস্থা ভাল নয় বলে বিয়েতে সম্মতি দিলেন না। আমারই ভালর জন্যে সম্বন্ধ করে বিয়ে দিলেন এক বড়লোকের সঙ্গে। আমাদের গোপন চোখের জল তাঁরা দেখেও দেখলেন না। 'ক' শুধু বলেছিল, মালতী আমি তোমারই। যদি তোমার কোন কাজে লাগতে পারি নিশ্চয় করে জানিও। মনে রেখো শুধু মন্তর পড়লেই বিয়ে হয় না। আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। কি যাদু ছিল এই কথার মধ্যে জানিনা, বিয়ের পর শ্বশুর

বাড়ীতে ফুলশয্যার রাত্রে আমার বিবাহিত স্বামীকে সমস্ত কথা খুলে বল্লাম। আপনি আমার শরীরটা পেতে পারেন কিন্তু মনটা পাবেন না; তা অনেকদিন হ'ল দেওয়া হয়ে গেছে আরেক জনকে।

উনি চুপ করে সব কথা শুনলেন। তারপর কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন। মনে মনে ভয় পেলাম। না জানি কি কাণ্ড বাঁধাবেন। প্রথমদিন থেকেই ওঁকে আমি ভয় করতাম। কালো, মোটা, প্রকাণ্ড চেহারা। আশ্চর্য্য উনি কিছুই বল্লেন না। পরদিন থেকে দেখলাম আমার বিছানা হয়েছে অন্য ঘরে।

দিন কয়েক বাদে 'ক' এসে হাজির। তাকে দেখে যত না খুসী হলাম আশ্চর্য্য হলাম তার চেয়ে বেশী।

—তুমি ?

—তোমার স্বামী ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তারপর ?

—আমাদের সব কথা শুনলেন। ছোট বেলা থেকে বিয়ের আগে পর্য্যন্ত সবকিছু।

—কি বল্লেন ?

—মালতী বলেছে সে আমায় শুধু শরীরটা দিতে পারে কিন্তু মন দিতে পারবে না। তাই ঠিক করেছি একটা জিনিষ যখন আপনাকে দিয়েছে, অন্যটাও দিক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি বলছেন, বুঝতে পারছি না।

তোমার স্বামী বললেন, মালতীকে আপনি নিয়ে যান।

—সেকি, সমাজ আছে, সংসার আছে।

ভদ্রলোক অদ্ভুত রকম হেসে বল্লেন, যখন ওর মন চুরি করেছিলেন তখনতো সমাজের কথা ভাবেননি, এখন তবে—

চুপ করে রইলাম। তখন তোমার স্বামীই বল্লেন, বেশ এতই যদি সমাজের ভয়, আমি ডিভোর্স করতে রাজী আছি। মালতীকে তার মত জিজ্ঞেস করে আসুন।

তাইতো তোমার কাছে এসেছি।

আমি কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। মনে মনে যাকে স্বামী বলে বরণ করেছি তাকেই বল্লাম, তুমি যা বলবে তাই হবে।

'ক' বল্লে, ভগবান আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন। যেখানে সত্যি-কারের প্রেম সেখানে তাঁর সহানুভূতি সব সময়।

নির্ম্মলবাবু জানিনা এরই মধ্যে আপনি হাঁফিয়ে উঠেছেন কিনা, কিন্তু এমনই মজা, একবার পুরোণোদিনের কথা বলতে সুরু করলে আর থামা যায় না। আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদ হল। তার ক'মাস বাদেই 'ক' আমাকে বিয়ে করে একঘরে হয়ে রইল কলকাতার সহরে। বলা বাহুল্য এ বিয়েতে কেউ ছিলেন না কয়েকজন সাক্ষী ছাড়া।

এরপর ছ'সাত বছর কি করে কেটে গেল সে ইতিহাস বলে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, আমাদের সুখের সংসারে সুজিত আর সুনীল এল তাদের নিয়েই আনন্দে কাটিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে আমার প্রথম স্বামীর সঙ্গে কথনও দেখা হয় নি, তবে তাঁর কথা মাঝে মাঝে কানে আসত। আমাকে বিবাহ বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যে আমার বাবা তাঁকে যারপর নাই লাঞ্ছিত করেন। সমাজের সব দরজা তাঁর মুখের উপর বন্ধ হয়ে যায়। মনে করেছিলাম ভদ্রলোক বিয়ে করবেন, কিন্তু করলেন না। মাঝে মাঝে শুনতাম ভদ্রলোক খুব বেশী পানাসক্ত হয়ে পড়েছেন, আরও শুনতাম, নিজের চরিত্রকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

কিন্তু এসবই শোনা কথা, দেখা হল আরও একবছর বাদে। তখন আমিও খুব মুস্কিলে পড়েছি। 'ক' র শরীর খুব খারাপ মাঝে মাঝে জ্বর হয়। অপিস থেকে লম্বা ছুটি নিলেন অথচ আমাদের সাহায্য করার কেউ নেই। ঠিক এমনি সময় অযাচিতভাবে এসে উপস্থিত হলেন আমার প্রথম স্বামী। বিনা ভূমিকায় 'ক'এর সঙ্গে দেখা করে

বল্লেন, অনেকদিন বাদে আপনাদের কাছে এলাম, যদিও আপনাদের সব খবরই আমি রাখতাম। এতদিন দেখা করিনি প্রয়োজন নেই মনে করেই। কিন্তু আজ মনে হ'ল যে আপনাদের বিপদের কথা শুনেও যদি না আসি তাহলে কর্ত্তব্যে অবহেলা করব। 'ক' বলেছিল, আপনার উদারতার পরিচয় আগেও পেয়েছি, এখনও পেলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদের কিছু নেই। আপনাদের এই বন্ধুহীন জীবনের জন্য আমিও তো অনেকাংশে দায়ী। সুজিত আর সুনীল ইতি মধ্যে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে চকোলেটের ঠোঙা দিয়ে সহজ গলায় বল্লেন, যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে অন্তঃত এই ভাগ্নেদের জন্যেও আমি মাঝে মাঝে আসব।

সত্যিই সেদিন চোখের জল সামলাতে পারিনি। আমাকে যে এক বন্ধন থেকে সাত বছর আগে মুক্তি দিয়ে আজ এভাবে আর এক বন্ধনে আবদ্ধ করবেন তা আগে ভাবতেই পারিনি। এর পর থেকে 'ক' এর সমস্ত ভার নিয়ে তিনি চিকিৎসা করলেন, সুজিত আর সুনীলকে আপন ভাগ্নের মত কাছে টেনে নিলেন, আর আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন সেই সুখের সংসার যা অভাব ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিয়ে ভেঙ্গে যেতে বসেছিল।

ঠিক এই সময় থেকেই আপনি আমাদের দেখেছেন। সব সময় উনিই আসতেন আমাদের বাড়ী 'ক' এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে, ছেলেদের বেড়াতে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমি ওঁর ফ্ল্যাটে গেছি খুব কম। তাই বাইরেটাই দেখতাম, ভাবতাম হাসি খুসি, সুখী মানুষ। কিন্তু সে ধারণা বদলে গেল এইবার অসুখের সময়। বুঝলাম মানুষটা কি ভীষণ একা, কতখানি অসহায়। আমি যে তাকে ফুল শয্যার রাত্রে বলেছিলাম, আপনাকে মন দিতে পারব না। সে কথা তিনি তখনও পর্য্যন্ত ভোলেন নি। আমার ঐ একটা কথা যে আরেক জনের প্রাণে এত গভীর ভাবে বাজতে পারে তা আগে বুঝিনি। একথা

ভুলতেই তিনি মদ ধরেছেন। বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত হয়ে নির্জনে বাস করেছেন। তিনি উদার, একথা আমরা জানতাম কিন্তু এতখানি মহৎ তা ভাবিনি।

উনি যে একা চেঞ্জে আসতে পারবেন তা আমি ভালো করেই জানতাম। কিন্তু একসঙ্গে আসার প্রস্তাব যে আমার পক্ষে করা কতখানি অসম্ভব ছিল তা আপনি এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। কিন্তু সবচেয়ে মজা হোল এখানে আসার পর। এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমরা তিনজনেই চেয়েছিলাম এই ভাবে একসঙ্গে বেরুতে, কিন্তু কেউই মুখ ফুটে বলতে পারিনি। তাই আপনি যখন একথা পাড়লেন আমরা সানন্দে মত দিলাম। আপনি এই যোগাযোগ না ঘটালে এই পরম সুখ থেকে আমরা তিন জনেই বঞ্চিত হতাম।

প্রীতি নমস্কারান্তে, ইতি—মালতী।

চিঠি পড়ে নির্ম্মল স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, সত্যিই কি অদ্ভুত ইতিহাস। ঠিক যেন গল্প। এভাবে যে তিনটি বিচ্ছিন্ন প্রাণী এক জায়গায় মিলতে পারে তা অবিশ্বাস্য। নির্ম্মলের মনে হ'ল রোহিনী বাবু, রাতুল ঘোষ আর মালতীর ভালবাসা প্রমাণ করবে সত্যিকারের প্রেমের রাজত্বে দেহের কান্না মূক হয়ে যায়।

নির্ম্মল ক'লকাতায় ফিরে এল একা। বাড়ীর সবাইকে নিয়ে সুবিমল আসবে দিন কয়েক বাদে। তার আগে নির্ম্মলকে অনেক কিছু ব্যবস্থা করে রাখতে হবে যাতে না কোলকাতায় এসে মার কিছু অসুবিধা হয়। বৌদি সব কথা শুনে হেসে বল্লেন, এর জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। মা যা যা বলেছেন আমাকে জানিও সব ব্যবস্থা করে রাখব। বিয়েটা তাহলে ফাল্গুন মাসেই ঠিক তো?

—সেই রকমই কথা আছে।

—বাঁচলাম। কদিন বেশ হৈ হৈ করা যাবে। বিয়ের বাজার করতে আমার খুব ভাল লাগে।

নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, মনীশ বাবু কবে ফিরছেন?

—দিন কয়েকের মধ্যেই। অনীতাদের বাড়ী একবার যেও।

নির্ম্মল সম্মতি জানায়। একটু পরে জিজ্ঞেস করে, অরুণাকে খুব মনমরা দেখলাম।

—তোমাকে ত লিখেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে থেকেই নির্ম্মল লক্ষ্য করেছে অরুণা ঠিক আগের মত নেই। একবার সামনে এল বটে, কেমন যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, ভাল আছেন?

নির্ম্মল উত্তর দেয়, হ্যাঁ, তোমার কি খবর?

—কোন খবর নেই, কিছু ভাল লাগছে না। আচ্ছা নির্ম্মলদা, ইচ্ছে করলেও কেন মানুষ মরতে পারে না?

—হঠাৎ একথা বলছ কেন?

—কি জানি। দাদাকে সেই যে তাড়িয়ে দিলেন ও আর আসে না—

—আমি তো তাড়াইনি, মণীশ বাবু বল্লেন তোমরা—

—নির্ম্মল থেমে যায়। তাকিয়ে দেখে অরুণার চোখ ছল ছল করছে। উদাস কণ্ঠে সে বলে, মণীশবাবু তো খুসী, খুব খুসী। ওঁর কি এসে যায়, দাদা তো আমার—

অরুণা আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে চলে যায়।

—নির্ম্মল অরুণার মাকে জিজ্ঞেস করে, অরুণার কি হয়েছে, এরকম মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?

অরুণার মা ক্লান্ত হাসি হাসেন, কি করে জানব বাবা ও মেয়ে যে কখন কি ভাবে বুঝতেই পারি না।

—তাহলেও একটা কিছু করা দরকার।

—কি আর করব। ঠিক করেছি অরুণাকে ওর পিসীমার বাড়ী কদিনের জন্যে পাঠিয়ে দেব, মণীশবাবু থাকলে যেতে দেন্ না—

—কেন?

—উনি পছন্দ করেন না। বলেন, আমি কত কষ্ট করে অরুণাকে সারাচ্ছি, পিসীমা টিসিমার বাড়ী গিয়ে আবার মাথা গোলমাল করে আসবে। তাই ভাবছি উনি যখন কলকাতায় নেই ওকে কদিনের জন্যে পাঠিয়ে দিই।

নির্ম্মল সায় দেয়, দরকার মনে করলে পাঠিয়ে দিন।

সেই দিনই অরুণা পিসীমার বাড়ী গেল। ঠিক হোল মণীশবাবু ফেরার আগেই ওকে নিয়ে আসা হবে।

সন্ধ্যেবেলা নির্ম্মল সানিপার্কে দেখা করতে যায়। বাইরের ড্রইং রুমেই নিবারণ সোম বসেছিলেন, শুকনো হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কবে ফিরলে নির্ম্মল, বাড়ীর সব খবর ভাল?

নির্ম্মল উত্তর দেয়, আজকেই ফিরেছি। মা এখন ভালই আছেন।

—ওঁরাও তোমার সঙ্গে এসেছেন নাকি?

—না। দিন কয়েক বাদে আসবেন।

—আমার স্ত্রী আর তোমার মা যে সহোদরা তা একটা ব্যাপারে বেশ বোঝা যায়। দু'জনেই দেখ্‌ছি ছেলের বিয়ে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েছেন।

নির্ম্মল হাসে, মাসীমার আবার কি হোল?

—হয়নি কিছু, তবে রঞ্জিত বোধ হয় মত পাল্টেছে—

—তার মানে?

—অনীতার চেয়ে মার্জারী বোসকেই এখন ওর গাড়ীতে বেশী দেখা যায়।

কথা শুনে নির্ম্মল বিস্মিত হয়। জিজ্ঞেস করে, রঞ্জিত বাড়ীতে আছে?

—না। ও গেছে মাকে নিয়ে কোন এক নাচের ফাংসানে। অবশ্য মার্জারীও সঙ্গে আছে।

—তাহলে পরে কথা বল্‌ব।

নিবাবণ সোম নিজের মনেই হাসেন, সেদিন তোমাদের বলেছিলাম আধুনিক যুবকরা গোঁফ আর বৌ স্বম্বন্ধে মনস্থির করতে পারে না। কি ঠিক বলিনি?

নির্ম্মলের আর এবিষয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগেনা। যতক্ষণ না রঞ্জিতের সঙ্গে তার খোলাখুলি কথা হচ্ছে তার স্বস্তি নেই।

এতদিন বাদে অপিসে গিয়ে নির্ম্মল দেখে অনেক কাজ জড়ো হয়েছে। দিন দু'ই আর মাথা তোলার সময় পায় না। বেশী রাত পর্য্যন্ত অপিসে থেকে টেবিল পরিস্কার করে।

যেদিন মণীশবাবুর ফিরে আসবার কথা, অরুণাকে আনতে পাঠানো হল। নির্ম্মল অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে। বউদি টেলিফোন করে জরুরী তলব পাঠিয়েছেন।

নির্ম্মল ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করে, কি খবর বৌদি, হঠাৎ জরুরী তলব?

বউদি আলনায় কাপড় গোছ করছিলেন, বল্লেন, তোমাকে ক'দিন থেকেই বলবো কিনা ভাবছিলাম, আজ বল্‌তেই হবে।

—কি বলুন?

—কাউকে বলতে পারবে না, এমন কি আমার স্বামীকে পর্য্যন্ত না।

—কি কথা তাই বলুন।

—বল্‌ছি। অরুণার মাকে কেউ বুঝিয়েছে কোথায় নাকি এক জাগ্রত দেবতা আছেন, সেখানে গিয়ে মানত করে পূজো করলে অরুণার পাগলামী সেরে যাবে। অথচ এর জন্য খরচ প্রায় দেড় শো টাকা।

অরুণার মা আমার কাছে টাকা চাইছেন অনেকদিন ধরে। স্বামীকে বলতে পারিনা কারণ উনি বিশ্বাস করেন না।

—তাহলে আপনি টাকা দেবেন কোথা থেকে ?

—সেই তো সমস্যা। আমিই বা না বলি কি করে। এসব মানতের ব্যাপারে আমারও বিশ্বাস নেই। তবু যখন ওর মার ইচ্ছে, আমার মনে হয় করতে দেওয়া ভালো। মনে সান্ত্বনা পাবেন।

নির্ম্মল সহজ হবার চেষ্টা করে, এতে আর ভাবনার কি আছে। আপনার যখন ইচ্ছে তাই হবে। টাকাটা আমি দিয়ে দেব।

বৌদি ব্যস্ত হয়ে পড়েন, না, না, তুমি টাকা দেবে কেন ? আমার কাছে একজোড়া ভাঙ্গা সোনার মাকড়ী আছে, ব্যবহার হয় না। বিক্রী করে দিলে আজ কালকার বাজারে দাম পাওয়া যাবে।

—সে আমি পারবনা, আপনার গয়না বিক্রী করতে যাব কেন ?

—বেশ কোরনা, বৌদি ছোট্ট উত্তর দেন। বোঝা যায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আস্তে বলেন, তোমার কাছ থেকে এ উত্তর আশা করিনি, ভেবেছিলাম আমার কথার অবাধ্য তুমি নও।

নির্ম্মল জবাব দিতে পারে না। বৌদির থমথমে মুখের দিকে চেয়ে তার আশ্চর্য লাগে। এই সদাহাস্যময়ী মেয়েটি যে এত গম্ভীর হতে পারে তা নির্ম্মলের কল্পনাতীত। সহজভাবে টেবিল থেকে কাগজ মোড়া গয়নার প্যাকেট তুলে নেয়। বলে, বিকেলের মধ্যে টাকা দিয়ে যাব।

—আমি জানতাম তুমি আমার কথা রাখবে, বৌদি হাসেন, মনে করে ওঁনার ফেরার আগে এনো।

—আচ্ছা, তাই আনব। কথা দিয়ে নির্ম্মল বেরিয়ে আসে।

কিন্তু গয়না সে বিক্রী করেনি। নিজের কাছেই রেখে দেয় পরে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। তবে সন্ধ্যেবেলা বৌদির হাতে একশো ষাট টাকার নোট গুনে দিয়ে বলে, যা পেয়েছি এনেদিলাম। ভাববেন না আমি কমিশন রেখেছি।

বৌদি টাকাটা আঁচলে বেঁধে নিয়ে হেসে বলেন, এই জন্তেই তো তোমাকে খবর দিই দরকারে অদরকারে। বোস ভাই, তোমার জন্তে মাল্‌পো করে রেখেছি।

সেই রাত্রেই রঞ্জিতের সঙ্গে সানিপার্কে মুখোমুখি দেখা। স্যুট পরে সেজেগুজে বাইরে যাচ্ছিল।

নির্ম্মলকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। জিজ্ঞেস করে, শুনলাম তুমি দু'দিন হ'ল ফিরেছ, কিন্তু কদিনই এতব্যস্ত ছিলাম।

নির্ম্মল থামিয়ে দেয়, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল।

—বল—

—বস্‌বি না ?

—চল গাড়ীতে একটা ড্রাইভ দিয়ে আসি। তোমাকে না হয় এখানে নামিয়ে দিয়ে যাব।

দুজনে এসে গাড়ীতে বসে। নির্ম্মল ভাবে কি ভাবে কথা স্থরু করবে। রঞ্জিত নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, কি বল্‌বে, অনীতার কথা তো ?

—হ্যাঁ! কি হোল ?

রঞ্জিত হাসে, হেরে গেলাম। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অনিন্দ্যকান্তি জিতেছে।

—তার মানে ?

—অনীতা ঠিক করেছে অনিন্দ্যকান্তিকে বিয়ে করবে।

—কি বল্‌ছিস্‌, আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না।

রঞ্জিত মাথা নাড়ে, ঠিকই বলছি। তুমি যখন অনীতাকে দেখে বলে ছিলে ও স্বার্থপর, তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি খুব বেশী মাত্রায় স্বার্থপর না হলে ও আমাকে নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করতে পারত না।

নির্ম্মল গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, কি কারণ দেখালে ?

—ওর বাবার নাকি ইচ্ছে অনিন্দ্যকান্তির সঙ্গে বিয়ে হয়। তাছাড়া অনীতার ধারণা আমি নাকি এখনও ছেলেমানুষ। বিবাহিত জীবনের গুরুত্ব বোঝবার বয়স আমার হয়নি।

—এতদূর এগিয়ে এই কথা মনে হ'ল ?

—তার উত্তরে বলে অনিন্দ্যকান্তির সঙ্গে মেশার আগে তফাৎটা ঠিক ধরা পড়েনি। রেগে গিয়ে বল্লাম তোমার মত স্বার্থপর মেয়ে পৃথিবীতে আছে আগে জানতাম না। চুপ করে থেকে অনীতা বল্লে, নিজের ভাল মন্দ বুঝে নেওয়া যদি স্বার্থপরতা হয় তাহলে আমি স্বার্থপর সন্দেহ নেই। তোমরাও তো পাঁচটা মেয়ে দেখে একজনকে বাছ আমি দু'জনকে যাচাই করেছি বলেই এত দোষ ?

রঞ্জিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে, উঃ কি জ্বালা ধরানো কথা। আমি ভাবতেই পারিনি অনীতা কি করে এতটা বদ্‌লে গেল। এ নিশ্চয় ঐ অনিন্দ্যকান্তির কাজ। প্রফেসার না হাতী। শুন্‌বে সারাক্ষণ ওর কানে লেকচার দিয়েছে নিজের গুণ বর্ণনা করে। আমাকে পরিষ্কার বলে দিলে, তোমার আর ভাবনা কি, মার্জারী বেসের কাছে ফিরে যাও এখুনি লুফে নেবে। তোমার গাড়ী আছে, বাড়ী আছে, চোখঝলসানো জামাকাপড় আছে, মার্জারীরা তো এই চায়। বিশ্বাস কর নির্ম্মলদা শুনে আমার পরিষ্কার মনে হোল, অনীতার মুখদিয়ে অনিন্দ্যকান্তি কথা বল্‌ছে।

নির্ম্মল একটা কথাও বল্‌তে পারে না। অনীতার কথা ভাবতেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। সাহস করে অনীতা এসেছিল অনিন্দ্যকান্তিকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে, কি স্পর্ধা।

দিন কয়েক পরের কথা। বোধ হয় রাত ন'টা হবে। নির্ম্মল চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে লিণ্ড্‌সে ষ্ট্রিটের দিকে চলেছে। সারাদিনের হৈ হৈ

ভরা ক'লকাতা, এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। চারিদিকে আলোর ফোয়ারা। তবু নির্ম্মল অনুভব করে আনন্দের অভাব। তা না হলে রাত ন'টার মধ্যেই সহর ঘুমিযে পড়ল কেন?

—নির্ম্মলবাবু।

নির্ম্মল ফিবে তাকায। বড় গাড়ী বারান্দার তলায় আবছা আলোয় কে যেন ডাকছে।

—শুনুন—

নির্ম্মল এগিযে গেল। সবোজ, কথা বলার সুযোগ না দিযে সরোজ একটানা বলে যায, বড ক্ষিদে পেয়েছে, যাহোক কিছু খাওয়াবেন? বিশ্বাস করুন, পকেটে এক পযসাও নেই।

সম্পূর্ণ অচেনা কণ্ঠস্বর, বোঝা যায সে মিথ্যে বলছে না।

—চলুন। বেশী কথা না বলে নির্ম্মল তাকে নিযে ঢুকে পড়ে কাছাকাছি একটা রেঁস্তবায। এতক্ষণে সে সরোজকে ভালো করে দেখে। রোগা আগের মতই, চোখের কোনে কালি। নাকের কাছে বড় কালশিরে পডেছে। নোংবা জামাকাপড, বোধহয কযেকদিন চান করেনি।

চেয়াবে বসে সে স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলে। অর্ডার মত খাবার পেয়ে সরোজ অভদ্রের মত গিলে যায, কোনদিকে তাকাবার ফুরসৎ পায় না। নির্ম্মল নিষ্পলক দৃষ্টিতে সবোজকে দেখে। চোখাচোখি হতেই সরোজ লজ্জা পায,—কি দেখছেন?

—কিছু না। নির্ম্মলের ছোট্ট উত্তর।

—আমাকে সবাই অসভ্য ভাবছে না?

—কেন?

—বড্ড খাচ্ছি।

থান্ না।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। সরোজ নিজে থেকেই বলে, মদ খেয়ে মাতলামি করার অভ্যেস আমার নয়।

নির্ম্মল তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়, তবে সেদিন ভীমরতি ধরেছিল কেন?

—বোধহয় তাছাড়া আর উপায় ছিল না।

—সে আবার কি?

অনেকদিনের কথা, দীর্ঘ পাঁচ বছরের ইতিহাস বিশ্বাস করুন একদিন আমার অবস্থা ভাল ছিল।

নির্ম্মলের কথা চালাবার প্রবৃত্তি হয় না। তবু বলে, জানি আপনার বাবা শেয়ার মার্কেটে সর্ব্বস্বান্ত হন—

—তারমানে?

সরোজ ভনিতা করে, ভেবেছিলাম বলব না কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনাকে বলা দরকার।

—বলুন।

—অরুণা আর আমি ভাই বোন নই।

—কি? নির্ম্মল চমকে ওঠে, অরুণা আপনার বোন নয়?

—না। সরোজ অল্প অল্প করে অনেক কথা বলে চলে। মেয়ে বউকে পথে বসিয়ে অরুণার বাবা মারা যান। সেই সময় যারা অরুণাদের সাহায্য করতে যেত সরোজ তাদের মধ্যে একজন।

সে লক্ষ্য করেছিল অনেকেই বন্ধু সেজে উপকার করতে এসে যথেষ্ট অপকার করে গেছে। অরুণা চিরদিনই রূপসী। যে কোন যুবকের পক্ষে তার ওপর অবৈধ সুযোগ নেওয়া সম্ভব ছিল।

সরোজ বলে, আমি তখনই বুঝতে পারি অরুণাকে বাঁচাতে গেলে তাদের সম্পূর্ণ ভার কাউকে নিতে হবে। তখন নিজের হাতে টাকা ছিল, অরুণার ওপরও খানিকটা মোহ ছিল নিশ্চয়ই, তাই সেদিন থেকে এদের ভার নিয়েছিলাম।

সরোজ যা বলে গেল তা নির্ভীক সত্য। প্রায় তিন বছর তার সঞ্চিত অর্থে অরুণাদের সে ভালভাবেই রেখেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার নিজের রোজগার ছিল না। সরোজ পেয়েছিল তার মাসীর সম্পত্তি,

নিজের বলতে সাতকুলে কেউ নেই। বিয়ের পরই বউ মরে যায়। তারপর থেকে অরুণাদের সঙ্গে আলাপ।

সরোজ বলে, আমার সঙ্গ মোটেই ভাল ছিল না। টাকার লোভে মাছির মত তারা আমার কাছে আসতো। অনেকদিন বুঝতে পারিনি, হয়ত কখনও রেসে গেছি, বাজী রেখে তাস খেলেছি। যে দিন ঘুম ভাঙ্গলো দেখলাম একরকম ফতুর হয়ে গেছি, যা সামান্য অবশিষ্ট ছিল দৈনন্দিন খরচায় নিঃশেষ হয়ে গেল। খানিকটা চুপ করে-থেকে বলে, বিশ্বাস করুন নির্ম্মলবাবু, আজ ছ'মাস যাবৎ আমি নিঃস্ব। হাতে একটি পয়সাও নেই।

—তাহলে এ'কমাস চল্লো কি করে? নির্ম্মল উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে।

—সে ইতিহাস আরও করুণ! আমার টাকা ফুরিয়ে যাবার পর, অরুণাদের বাঁচবার আর কোন উপায় রইল না। একটি মাত্র পথ যা খোলা ছিল, অরুণাকে তাই নিতে হয়। পাগলামীর আবরণে নিজেকে লুকিয়ে রেখে মার প্ররোচনায় অরুণা ধাপে ধাপে নামতে সুরু করলো। অথচ আমার কথা ভাবুন দেখি, একদিন যাকে ভালবেসেছিলাম আজ তাকে মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার উপায় নেই। অসহায় আমি সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু সেদিন আর পারিনি।

অরুণা আপনাকে ভালবেসেছিল?

—তা জানি না। তবে আমার উপকারের কথা ওর মনে ছিল। তাই এ ছ'মাস আমাকে সে রেখেছিল দাদা সাজিয়ে। কিন্তু অরুণার মা আমাকে দেখতে পারতেন না, অবশ্য কোনদিনই তিনি আমাকে চান নি, চেয়েছিলেন আমার টাকা।

নির্ম্মল অনুভব করে সে ঘামছে। বাধ বাধ গলায় জিজ্ঞেস করে, এখন ওরা চালাচ্ছে কি করে?

সরোজ হাসে, আপনাকে ভাবতাম বুদ্ধিমান, এইটুকু বুঝতে

পারছেন না ? অরুণাকে দিয়ে পাগলামীর অভিনয় করিয়ে তার মাঁ, নতুন শিকার ধরেছে, তাই তো আমাকে তাড়িয়ে তাকে শোষণ করার ব্যবস্থা।

সরোজ হাসে, ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি, মণীশবাবুর চিকিৎসা এখনও চলছে তো ?

—হ্যাঁ।

—বেশ কিছুদিন চলবে। তবে কিছু বলার উপায় নেই। এখন তো আর ওঁর মত সামর্থ্য নেই। অতএব উনি যা করবেন তাই শোভা পাবে। অরুণাদের কিছু বলা যায় না, ওদেরও তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। বিলের টাকা চুকিয়ে দুজনেই রাস্তায় বেরিয়ে আসে, সরোজ ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে বলে, বড্ড খিদে পেয়েছিল, আপনাকে ধন্যবাদ।

নির্ম্মল হঠাৎ প্রশ্ন করে, অরুণা প্রায়ই পিসিমার বাড়ী যায়, তিনি কে ?

সরোজ আবার হাসে, মণীশবাবু এখনও পিসীমার বাড়ী যেতে দেন ? ভদ্রলোককে উদার বলতে হবে, একটু থেমে কি ভেবে নিয়ে বলে, বাইরে রাত কাটাতে হলে একটা ঠিকানা বলতে হবে তো, সেই সম্পর্কের পিসীমা,—আচ্ছা রাত, হয়ে যাচ্ছে, আজ আসি, নমস্কার।

যদি দরকার পড়ে ভেবে নির্ম্মল নোট বই-এ সরোজের ঠিকানাটা লিখে নেয়। আজ তার মনে ঝড় বইছে, একি সত্যি! সহরের সভ্য সমাজে বাস করেও বর্ব্বরতার একি উলঙ্গ প্রকাশ !

ট্যাক্সি—নির্ম্মল ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। গাড়ী, বাড়ীর দিকে চলেছে। নির্ম্মলের বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে সে এগিয়ে যায় মণীশবাবুর ফ্ল্যাটের দিকে, বাইরের জানলা থেকে ভেতরের ঘর দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। বৌদি বসে সোয়েটার বুনছে, হয়ত অরুণার জন্ম। অদূরে মণীশবাবু ছেলেকে আদর করছেন, পারিবারিক জীবনের কতখানি মিথ্যা অভিনয়। নির্ম্মলের সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে।

নির্ম্মল ঘরে এসেও ঘুমুতে পারে না। আলো নিভিয়ে চুপ করে ইজি চেয়ারে বসে থাকে। বৌদির জন্যে তার দুঃখ হয়, সে তো স্বামীকে কোনদিন সন্দেহ করবে না। নির্ম্মলের সমস্ত শরীর গুলিয়ে ওঠে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তার খেয়াল নেই। ভেবেছিল দরজা খোলা আছে, উঠে বন্ধ করে দেবে কিন্তু হয়নি, অনেক রাত্রে কার কোমল স্পর্শে নির্ম্মলের ঘুম ভেঙ্গে যায়, কে ?

নির্ম্মল অন্ধকার রাতেও বুঝতে পারে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে অরুণা। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে ভেতর থেকে বন্ধ। নিশ্চয় অরুণা ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিয়েছে। নির্ম্মলের ইচ্ছে করে সজোরে চাবুক মেরে অরুণার পাগলামীর মুখোশ খুলে দেয়। যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত করে বলে, অরুণা তুমি এত নীচ, এত কদর্য্য। বেরিয়ে যাও এঘর থেকে—

অরুণা এক পাও নড়ে না। চেয়ারের উপর বসে পড়ে। নির্ম্মল উঠে দাঁড়ায়। জ্বালা ধরানো গলায় বলে, আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। যে জঘন্য মনোবৃত্তি নিয়ে লোক ঠকিয়ে বেড়াচ্ছ তার চরম শাস্তি পাবার দিন এগিয়ে এসেছে—

নির্ম্মল বোঝে অরুণা কাঁদছে। আবছা অন্ধকারে দেখতে পায় তার চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ছে। কোনরকমে সে বলে, বিশ্বাস করুন আমি আসতে চাই নি। মা আমাকে—, এই অবধি বলে ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকায়।

—নির্ম্মল বোঝে অরুণার মা এখনও বাইরেই অপেক্ষা করছেন। কেন জানা নেই নির্ম্মলের এই হতভাগিনীর জন্য করুণা হয়। জিজ্ঞেস করে, তুমি সরোজকে ভালবাস ?

অরুণা মৃদু স্বরে বলে, হ্যাঁ।

—তাকে বিয়ে করলে সুখী হবে ?

অরুণা কোন উত্তর দেয় না।

—যদি সরোজকে বিয়ে করে নিজের জীবনটা বদলাতে চাও তাহলে কাল আমার কাছে এস, এই সময়ে—

অরুণা নিজেকে সংযত করে বলে, দয়া করে মাকে এখন কিছু বলবেন না।

—সে বুদ্ধি আমার আছে। এখন তুমি যেতে পার।

অরুণা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

—নির্ম্মল আবার ইজিচেয়ারে বসে পড়ে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয় কেন সে এই বিশ্রী নোংরা ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেল্‌ল। এখন যদি সরোজ অরুণাকে বিয়ে করতে না চায়। আর চাইলেও এদের থাওয়া পরার ব্যবস্থা নির্ম্মল করবে কি করে? তবে একমাত্র ভরসা রাতুল ঘোষ, সে যদি নির্ম্মলের অনুরোধে সরোজকে একটা চাকরী দেয়।

এই সব নানারকম চিন্তা করতে করতে নির্ম্মল নিজের অজান্তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভাঙ্গল বেশী দেরী করে। বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। জিজ্ঞেস করলে, আপনার শরীর খারাপ হয়নি তো বাবু?

—না।

বেয়ারা একটা চিঠি নির্ম্মলের দিকে এগিয়ে দেয়, অরুণা দিদির মা আপনাকে এই চিঠিটা দিতে বল্লেন।

নির্ম্মলের সারা শরীর ঘিন ঘিন করে। এক লাইনের চিঠি, "হাতে আজ একটি পয়সাও নেই, কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও।"

স্পষ্ট বোঝা যায় এ অনুরোধ নয় দাবী। গোলমাল না বাড়িয়ে নির্ম্মল একখানা দশটাকার নোট খামে ভরে অরুণার মার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

নির্ম্মলের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ অমূলক তা প্রমাণ হ'ল সেইদিন রাত্রি

বেলাই। অরুণাকে বিয়ে করার প্রস্তাবে সরোজ অধীর আগ্রহে নির্ম্মলের হাত চেপে ধরে বলে, এ আমার জীবনের স্বপ্ন, আমি যে ওকে কতখানি ভালবাসি—

নির্ম্মল থামিয়ে দিয়ে বলে, তবে আগে বিয়ে করেননি কেন ?

—যখন টাকা ছিল এমন হৈ হৈ করে দিন কেটে গেছে বিয়ের চিন্তা করার ফুরসৎ পাইনি। যখন ফুরসৎ পেলাম তখন আর সামর্থ্য নেই।

—বেশ, আজ আপনি আমার ঘরেই থাকুন। রাত্রে অরুণা এলে তার সঙ্গে সব বিষয়ে পাকা করে আমায় জানাবেন। তাহলে আপনার জন্যে চাকরীর দরখাস্ত করব।

অরুণা অভিসারে এলো রাত বারোটার পর। আজ সে অপরূপ সাজে সেজেছে। সরোজকে দেখে চোখের জল সামলাতে পারে না। তার কোলের ওপর মাথা রেখে বসে পড়ে।

ভোর রাত্রে তারা এসে নির্ম্মলকে ঘুম থেকে তোলে, দুজ'নে একসঙ্গে প্রণাম করে। নির্ম্মল ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, যাক্ তাহলে কারুর আপত্তি নেই তো ?

অরুণা চোখতুলে নির্ম্মলের দিকে তাকায়। টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ে, নির্ম্মলদা এতদিনে আপনি কথা রেখেছেন। আমার হারিয়ে যাওয়া বরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে।

আজ অরুণার কথায় এমনই একটা সুর ছিল যাতে নির্ম্মল কিছুতেই চোখের জল সামলাতে পারে না। সরোজ আর অরুণার কাঁধের ওপর হাত রেখে বলে, তোমরা সুখী হও, এই প্রার্থনা করি।

নির্ম্মল সরোজের চাকরীর জন্য অনুরোধ করে রাতুল ঘোষকে চিঠি লিখল গিরিডীতে। একথা জানাতে ভুলল না সরোজ বিশ্বাসী লোক এমনকি তার হয়ে নির্ম্মল নিজেই জামিন থাকতে রাজী আছে। ইতিমধ্যে বৌদি একদিন ডেকে পাঠালেন। চাপা গলায় ফিস্

ফিস্ করে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সঙ্গে ওঁর কোন ঝগড়া হয়েছে নাকি ঠাকুরপো।

—একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন বৌদি?

—উনি আমায় বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছেন তোমার সঙ্গে যেন কোনরকম যোগাযোগ না রাখি।

—কি কারণ বল্লেন?

—তা কিছু বলেন নি। কিন্তু তুমি তো জান, তাঁর কথার অমান্য আমি কখনও করি না।

নির্ম্মলের মাথার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সত্য মিথ্যাটাও একবার বিচার করে দেখবেন না।

বৌদি হাসেন, সেই চির পরিচিত হাসি। সে অধিকার আমাদের নেই, স্বামীর কথাই আমার কাছে বেদবাক্য।

—তবে আর আমাকে ডাকার কি দরকার ছিল। উনি যখন সম্পর্ক রাখতে বারণ করেছেন সে বালাই না রাখাই তো ভাল।

—ডাকলাম, পাছে তুমি আমায় ভুল বোঝ। বিশ্বাস কর তোমাকে আমি নিজের ভাইএর মত দেখেছিলাম। তোমার মা আসবেন, ভাই বোনেরা আসবে, সবচেয়ে বড় কথা তোমার নতুন বৌ আসবে; অথচ, অথচ আমি হয়ত এসবের মধ্যে থাকতে পারব না, এ দুঃখ তো ভোলবার নয়।

কথা বলতে বলতে বৌদির গলা ভিজে আসে! ছলছল চোখে বল্লেন, জানি না কি নিয়ে তোমাদের মনোমালিন্য হয়েছে, অন্ততঃ আমার কথা ভেবেও মিটিয়ে ফেল। নইলে এ হবে আমার নির্ব্বাসন দণ্ড।

উচ্ছ্বসিত চোখের জল সামলাতে সামলাতে বৌদি পাশের ঘরে চলে যান। ম্লান মুখে নির্ম্মল বাইরে বেরিয়ে আসে।

পর দিন অফিসে অনেক কাজ ছিল। নির্ম্মল ঠিক করেছিল আজ আর বাইরে লাঞ্চ খেতে না গিয়ে অফিসেই কিছু আনিয়ে নেবে। তাহলে সে সময়টাও কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু ঠিক একটার সময় ধুতি পাঞ্জাবী পরা যে ভদ্রলোক ছাতা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল তাকে দেখে নির্ম্মলের আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না, সে অনিন্দ্যকান্তি। আর যেই হোক অনিন্দ্যকান্তিকে সে মোটেই এসময় আশা করে নি। ভদ্রলোক হাত তুলে নমস্কাব করে বলেন, কি খবর নির্ম্মলবাবু, নিছক নিজের দরকারে আপনার কাছে এসে হাজির হলাম।

নির্ম্মল হাসবার চেষ্টা করে, কি ব্যাপার ?

—আপনাদের কোম্পানীর অ্যাসিষ্টেণ্টের পোষ্টে একজন লোক নিচ্ছে তাই বলতে এসেছিলাম আমার ভাইকে যদি আপনি একটু সাহায্য করেন—

—দরখাস্ত পাঠিয়েছেন ?

—সে সব করা হয়েছে। আপনারা যা কোয়ালিফিকেশান চান আমার ভাইএর সব আছে। তবে ওসবে তো আজকাল চাকরী হয় না, আসল হল ধরা করা। তাই আপনার কাছে এলাম যদি একটু হদিস দেন—

নির্ম্মল এড়িয়ে যায়, এখানে ইণ্টারভিউ.হবে—

—আহা তাইতো জিজ্ঞেস করছি কারা নেবেন ? নামগুলো জানলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি তাঁদের বাড়ী যাওয়া যায় কিনা—

নির্ম্মল উঠে পড়ে, তাহলে দিন দুই বাদে আসবেন দেখব কিছু করতে পারি কি না।

অনিন্দ্যকান্তি ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ে। কথা বলতে বলতে দুজনেই বেরিয়ে আসে। দরজার মুখে এসে অনিন্দ্যকান্তি সহজ গলায় জিজ্ঞেস করে, অনীতাদের বাড়ী সম্প্রতি গিয়েছিলেন নাকি ?

—না।

—আমারও অনেকদিন যাওয়া হয়নি। শুনেছিলাম বিকাশবাবু রাঁচিতে কোন কলেজের প্রফেসারী পেয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত কি হল জানি না। আচ্ছা নমস্কার। আজ চলি।

অনিন্দ্যকান্তি চলে যায়। তার শেষ কথাগুলো নির্ম্মলকে ভাবিয়ে তোলে। রঞ্জিতের কাছে অনীতার বিষয়ে শোনা অবধি নির্ম্মল মনে মনে ঠিকই করে নিয়েছিল অনীতার সঙ্গে অনিন্দ্যকান্তির সম্পর্ক খুব গভীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজকের কথাগুলো নির্ম্মলের সব ধারণাই বদলে দিল। ঠিক করে তু'একদিনের মধ্যেই একবার অনীতার বাড়ী যাবে।

নির্ম্মল কদিন থেকেই আশা করছিল রাতুল ঘোষের চিঠি আসবে কিন্তু চিঠির বদলে ঘোষ সাহেব যে নিজেই এসে উপস্থিত হবেন তা' সে মোটেই ভাবে নি। এমন কি বেয়ারা যখন অফিস থেকে ফেরার পর জানালো ঘোষ সাহেব সেলাম দিয়েছেন নির্ম্মল বার তুয়েক তাকে প্রশ্ন করেছে, তুই দেখেছিস ঘোষ সাহেবকে?

—উনি নিজে এসে বলে গেলেন।

নির্ম্মল আর দেরী করে না, হাত মুখ না ধুয়েই রাতুল ঘোষের ঘরে এসে হাজির হয়। সেই আগের মতই সাজানো ঘর। টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে রাতুল ঘোষ ইংরিজি পত্রিকার পাতা উল্টোচ্ছেন। নির্ম্মলকে দেখে হাসিতে মুখ ভরে যায়, সেই কান এঁটো করা হাসি।

নির্ম্মল নিজে থেকেই প্রশ্ন করে, কবে এলেন?

—আজই, সকালের গাড়ীতে।

—আপনার শরীর কি রকম আছে বলুন। সুজিত, সুনীল—

রাতুল ঘোষ নির্ম্মলের হাত ধরে নিজের কাছে বসান, সব ভাল ভাই। খুব একটা জরুরী মিটিং ছিল, তাই কদিনের জন্যে কলকাতায় আসতেই হোল। ভাবছি কালই চলে যাব।

—বাঃ বাঃ খুব ভালো কথা। আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অনেক ফ্রেশ্। পশ্চিমের জল হাওয়ার এই বড় গুণ—

রাতুল ঘোষ থামিয়ে দেন, শুধুই কি জলহাওয়ার গুণ? আমার তো বিশ্বাস চেঞ্জটা সব সময় দরকার মনের, শরীরের নয়। এবারে সেই চেঞ্জটা হয়েছে।

রাতুল ঘোষ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, কাল চলুন না আমার সঙ্গে—

—কোথায়?

—গিরিডিতে।

নির্ম্মল অবাক না হয়ে পারে না, সেকি, আমার অফিস নেই!

—কালই যেতে বলছি না। শনিবার দুপুরে গিয়ে সোমবার সকালে ফিরে আসবেন।

এ প্রস্তাবে নির্ম্মলের রাজী না হওয়ারই কথা। ক'দিন মাত্র সে বহরমপুর থেকে ফিরছে। এখনও তার টেবিলের উপর বহু কাজ, শেষ করা হয়নি। বলে, দেখি, কিন্তু কথা দিতে পারছি না।

—আপনি গেলে সত্যি খুসী হবেন। মালতীও বার বার করে যেতে বলে দিয়েছে আর আমারও বিশেষ অনুরোধ।

রাতুল ঘোষ কি যেন ভেবে নেয়। বলে, আপনি জানেন না নির্ম্মলবাবু আমার জীবনটা কি ভয়ানক রকমের ফাঁকা ছিল। আজ তা' ভরে গেছে। ভাবতাম কি জন্যে ভূতের মত খাটছি, আর এই টাকা রোজগার করবো কার জন্যে। হতাশায় মন ভরে থাকতো।

—সেকি আমি বুঝিনি?

—বাইরে থেকে কি বুঝবেন নির্ম্মলবাবু। কতদিন মনে হয়েছে সব

ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশে চলে যাই। মনে হয়েছে মদ খেয়ে সব ভুলে থাকি। কিন্তু ভুলতে পারলাম কই? একটু থেমে বলে, এখন আমার মন শান্তিতে ভরে গেছে। আর কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আমি জানি সুজিত সুনীল বড় হবে। ওরা আমার ব্যবসার ভার নেবে।

নির্ম্মলের কিছু বলার ছিল না, তবু বলে, ওরা আপনাকে বড় ভালবাসে।

শুধু ভালবাসা নয়, চেয়েছিলাম একটা অধিকার সে যত সামান্যই হোক না কেন। এতদিনে তা পেয়েছি। রোহিণীবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ হয় নি। হলে দেখবেন উনি এক অসাধারণ মানুষ। কি উদার, কি মহৎ। রাতুল ঘোষ নিজের মনেই বলে, এখন আমায় বাঁচতে হবে, রোজগার করতে হবে। সংযত হতে হবে। বিশেষ করে সুজিত আর সুনীলের জন্যে। ওদের মানুষ করার দায়িত্ব শুধু তো বাপ মার নয়, মামার উপরও অনেকখানি।

রাতুল ঘোষ আজ আর নির্ম্মলকে ছাড়ে না। কত কথা বলে যায়। সেই আগের মত উচ্ছ্বাস, কিন্তু তাতে আর ব্যর্থতার গ্লানি নেই।

নিজের থেকেই বলে, সরোজের কথা লিখেছিলেন, নিজে আসছি বলেই আর চিঠির উত্তর দিই নি। ওকে কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি বলে, ছেলেটা সত্যি ভাল।

—তা কি জানি না, নইলে আপনি তার জন্যে বলবেন কেন। ওকে ভাল কাজই দেব।

—অনেক ধন্যবাদ। আজ রাত্রে কি করছেন?

—বিশেষ কিছু নয়। দু'একটা জিনিষ কিনতে বাজারে যাব। চলুননা আজ বাইরে কোথাও খাওয়া যাক্।

নির্ম্মল সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে আসে।

ঘরে ফিরেই অরুণাকে ডেকে পাঠাল নির্ম্মল। অরুণা এলো একটু পরেই আট পৌরে ডুরে শাড়ী পরে। এই কদিনেই তার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। চোখের তলায় সে কালির দাগ আর নেই। উজ্জ্বল আশায় ভরা মুখ। চোখের কোণেও সেই ভাষা যার মর্ম্ম বোঝে শুধু নির্ম্মল আর সরোজ।

অরুণা এসেই গল্প স্থরু করে, আজ আমরা কত জায়গায় ঘুরলাম।

নির্ম্মল স্মিত হাসে, কোথায় গিয়েছিলে ?

—ফ্ল্যাট খুঁজতে। সরোজ আর আমি বিকেল থেকে ঘুরছি। ওর বড় ইচ্ছে কমের মধ্যে ভদ্র পাড়ায় একটা বাসা করে।

—মাকে জানিয়েছ ?

অরুণার মুখ গম্ভীর হ'য়ে যায়, না, এখনও জানাইনি।

--চাওতো আমি কথা বলতে পারি।

—না, যা বলবার আমি বলবো। অরুণার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। মা বুঝতে ঠিকই পেরেছেন, তবে খোলাখুলি কথা হয়নি এই যা। সরোজের ইচ্ছে বাড়ী ঠিক করে মাকে নিয়ে আমরা চলে যাব। তবে—

—কি তবে ?

অরুণা নীচু গলায় বলে, চাকরী না পেলে তো কিছুই হবে না।

অরুণার মুখ থেকে সাংসারিক কথা শুনতে নির্ম্মলের ভাল লাগে। বলে, বিয়ের নোটিশ দিয়েছো ?

—হ্যাঁ, এই মাসেই হয়ে যাবে।

—সরোজের সঙ্গে দেখা হবে আজ ?

—ও আসবে বলেছে একটু পরে।

—ওকে বোল কাল সকালেই রাতুল ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে। চাকরী ঠিক হয়ে গেছে, কাল থেকে ওকে অপিসে যেতে হবে।

অরুণার মুখ থেকে কথা বার হয় না, হাসিমাখা চোখ থেকে জলের ধারা নেমে আসে।

—আপনি আমাদের জন্তে কত করলেন নির্ম্মলদা, সরোজ ঠিকই বলে আপনার তুলনা হয় না।

কথাগুলোর মধ্যে এমনই আন্তরিকতা ছিল, নির্ম্মলেরও চোখে জল এসে যায়। সস্নেহে অরুণার মাথায় একটা হাত রাখে।

অরুণা চলে গেলে নির্ম্মল তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নেয়। সানি পার্কে যাবে একটু তাড়াতাড়ি, রোজই বড় দেরী হয়ে যায়। কিন্তু বেরনো হল না। রঞ্জিত আর মার্জারী এসে হাজির। রঞ্জিত জিজ্ঞেস করে, নির্ম্মলদা কোথাও বেরচ্ছ না কি?

—নারে, এম্‌নি তোদের দিকেই যাচ্ছিলাম।

—তাহলে চল আমরা একসঙ্গে বেড়িয়ে আসি।

—সেকি একেবারে বস্‌বিনা, মার্জারী তুমি কি বল?

—মার্জারী মিষ্টি করে হাসে, রঞ্জিত যাই করুক, আমি তো এখন বস্‌বই। এতগুলো সিঁড়ি উঠেই আবার নামতে হবে।

—আমিও তো তাই বলছিলাম। বেয়ারাটাকে চা করতে বলি।

রঞ্জিত বাধা দেয়, না না, ওসব হাঙ্গামা কর না নির্ম্মলদা, বেরবই যখন একটা ঠাণ্ডা ঘরে বসে চা খাওয়া যাবে।

নির্ম্মল রঞ্জিতের হাতের আংটিটা দেখে বলে, তুই আবার আংটি পরছিস্ কবে থেকে? জান মার্জারী, ছোটবেলা থেকে ওর এমন শুচি-বাই ছিল, আংটি পরলেই খুলে ফেলে দিত। বল্‌তো ওতে ময়লা জম্‌বে—

মার্জারী খিল্ খিল্ করে হাসে, কি ফানি আইডিয়া তোমার রঞ্জিত!

রঞ্জিত মুখ নীচু করে বলে, এ আংটীর গুরুত্ব আছে নির্ম্মলদা এটা মার্জারী আমায় দিয়েছে—

নির্ম্মল তারিফ করে বলে, তোমার পছন্দর প্রশংসা না করে পারলাম না মার্জারী, এন্‌গেজমেণ্টরিং এত সুন্দর আগে দেখিনি।

এদের মধ্যে কথা চল্‌ল অনেকক্ষণ ধরে। রঞ্জিতের চিরন্তনী ঠাট্টা,

মার্জারীর ইংরিজী-ঢঙে বাংলা কথা বলা আর নির্মলের সাধারণ মন্তব্য।

একসময় রঞ্জিত মার্জারীকে বলে, নির্মলদার বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে।

মার্জারী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, তাই নাকি, কার সঙ্গে?

—তাকে আমরা চোখে দেখিনি, ছবিতে দেখেছি।

—সে তো আরো রোমান্টিক, মার্জারী হাততালি দিয়ে বলে, সেই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা—'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'-এর নামও ছবি।

নির্মলের দিকে তাকিয়ে আবদারের সুরে বলে, ছবিটা আমাকে দেখান না নির্মলদা, প্লীজ—

মার্জারীর কথাটা নির্মলের কানে গিয়ে বাজে। এ সেই এক সুর, এক কথা। এখানে বসেই অনীতা ঠিক এমনি ভাবে নির্মলের কাছে ছবি দেখার জন্যে আবদার করেছিল। নির্মল অভিভূতের মত দেরাজ থেকে ছবি বার করে মার্জারীর হাতে দেয়।

কেন জানা নেই অনীতার সঙ্গে দেখা করার জন্যে নির্মলের মন অধীর হয়ে ওঠে। তাই রঞ্জিতদের সঙ্গে গাড়ীতে বেরুলেও লেকের কাছে এসে সে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। বলে, আরেকদিন তোমাদের সঙ্গে কাটাব, ভুলে গিয়েছিলাম আজ আর এক জায়গায় যাবার কথা আছে।

নির্মল যখন অনীতাদের বাড়ীর সামনে এসে হাজির হল তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

বিকাশ বাবু বাইরের ঘরেই বসেছিলেন। প্রথমটা চিনতে না পারলেও পরিচয় পেয়ে আপ্যায়িত করলেন।

—আসুন, ভেতরে এসে বসুন। বুড়ো হয়েছি, চোখের দৃষ্টিও কমেছে। অনেক সময় চিনতে ভুল করি।

—নির্ম্মল হেসে বলে, তাতে আর কি হয়েছে ?

—আপনি তো অনেকদিন আসেন নি।

—আমি কিছু দিন কলকাতার বাইরে ছিলাম।

বিকাশবাবু মাথা নাড়েন, বেশ বেশ। শুনেছেন বোধ হয় আমি আবার মাষ্টারী করব ঠিক করেছি।

—সে তো ভাল কথা, কোন কলেজে ?

—রাঁচীতে। নতুন কলেজ হয়েছে, ব্যবস্থা সব ভালই শুনছি। থাকবার জায়গাও দেবে। তাছাড়া অনীতারও এতদিনে সুবুদ্ধি হয়েছে, বলছে তো প্রাইভেটে এম. এ-টা দেবে।

—কবে যাবেন রাঁচী ?

—দিন দশেক বাদে। তবে কি জানেন, বিকাশবাবু গলা নামিয়ে বলেন, অনীতাকে বলবেন না, আমি ওর জন্যে একটী পাত্র ঠিক করেছি। আমারই ছাত্র—

নির্ম্মল আর কৌতূহল থামাতে পারে না, জিজ্ঞেস করে, অনিন্দ্য-কান্তির কথা বলছেন ?

বিকাশ বাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, না, না, তাকে তো অনীতার পছন্দই হোল না। তাই এবার আর প্রফেসার নয় ইঞ্জিনিয়ার ছেলে, একে পছন্দ নিশ্চয়ই হবে—

অনীতা ঠিক এই সময় বাইরে থেকে বাড়ীর ভেতরে ঢোকে। নির্ম্মলকে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে বলে, নির্ম্মলদা, উঃ কতদিন বাদে—

—আমি যে এখানে ছিলাম না।

—জানি, আমিতো গিয়েছিলাম। অনীতা যেন থামতে চায় না। সকলের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে, অরুণা, মণীশবাবু, বৌদি, সকলের খবর। নির্ম্মলের বিয়ে হচ্ছে কবে, মা কবে আসবেন। এমনকি রাতুল ঘোষের কথাও।

নির্ম্মল যত সংক্ষেপে সম্ভব সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। বিকাশবাবু

এক সময় উঠে যান। তাঁর খাবার সময় হয়ে গেছে। অনীতা বলে একটু বসুন নির্ম্মলদা, আমি বাবার খাবার দিয়ে এখুনি আসছি।

নির্ম্মল বসে বসে ভাবে অনীতার এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নি। ঠিক আগের মতই আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এতক্ষণের মধ্যে একবারও সে রঞ্জিতের কথা জিজ্ঞেস করেনি। অথচ আগে তার কথা নিয়েই ভরে থাকত সে। এইখানেই যা পরিবর্তন।

অনীতা ফিরে এলে নির্ম্মল জিজ্ঞেস করে, তুমি এম. এ পড়ছ তাহলে?

—ঠিক পড়ছি না, পড়ব ভাবছি।

নির্ম্মল ইতস্তত: করে জিজ্ঞেস করে, একটা প্রশ্ন করব, উত্তর দেবে?

অনীতা গম্ভীর হয়ে যায়, আমি জানি আপনি কি জিজ্ঞেস করবেন। সেই কথা বলতেই তো আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম। পাইনি আপনাকে। ভেবেছিলাম শিগ্‌গীর ফিরে আসবেন, তাও এলেন না।

—তাতে কি ক্ষতি হয়েছে অনীতা?

—কিছুনা। তবে আপনাকে পেলে হয়ত পরামর্শ করতে পারতাম।

—কিসের পরামর্শ?

—আমার জীবনের যা সবচেয়ে বড় সমস্যা তার।

—এত হেঁয়ালী করে কথা বলছ কেন? আমি বুঝতে পারছি না—

—নির্ম্মলদা, কাউকে যদি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসে, ইচ্ছে করে দূরে সরিয়ে দিতে হয় এ যন্ত্রণা যে কতখানি, তা কি আপনি বুঝতে পারেন না?

নির্ম্মল বিস্মিত হয়, এ কি বলছ অনীতা?

অনীতা যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত করে, সত্যিই বল্‌ছি। ছোট-

বেলায় আমার চামড়ার রোগ ছিল, সোরাইসিস্। এ বড়বিশ্রী রোগ; একবার রক্তে ঢুকলে আর নিস্তার নেই। বংশ পরম্পরায় চলে। আমার মামারবাড়ী থেকে পেলাম আমি। চার বছর চিকিৎসা করে সেরে গেল বটে, কিন্তু ডাক্তাররা বলেছিলেন আবার হয়ত অনেক বছর বাদে এ রোগ ফিরে আসতে পারে। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও নামতে পারে।

নির্ম্মল বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কত বছর আগেকার কথা ?

বছর দশ বারো। আমিতো ভেবেছিলাম সেরেই গেছি। কিন্তু এই ক'মাস আগে চান করতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম আমার গায়ের চামড়া খস্ খস্ করছে। মনে মনে ভীষণ ভয় পেলাম। ছুটে গেলাম সেই ডাক্তারের কাছে। তিনি দেখে বল্লেন ভয় আমার মিথ্যে নয়। এ সেই পুরোন চামড়ার রোগ। এখন এর প্রকাশ মৃদু হলেও পরে যে বাড়বে না কে বলতে পারে? তাই মনে মনে ঠিক করলাম বিয়ে আর করব না। নিজে যা কষ্ট পাবার তাতো পেলাম। কিন্তু ভবিষ্যতের নিষ্পাপ শিশুদের আর এর মধ্যে টেনে আনতে মন চাইলো না।

একথা বাবাকে বলেছ ?

না।

রঞ্জিতকে ?

না।

কেন ?

অনীতার মুখ ব্যাথায় ভরে যায়, বলে, আপনি তো জানেন নির্ম্মলদা রঞ্জিত বংশগত রোগকে কি ভীষণ ভয় পায়। আপনার সামনেই একদিন গাড়ীতে অরুণার পাগলামী সম্বন্ধে বলেছিল, মনে নেই ?

নির্ম্মল মাথা নাড়ে, সে কথার সঙ্গে এর কোন মিল ছিল না অনীতা, রঞ্জিত তোমায় সত্যিই ভালবাসে—

—সেই জন্যেই তো আরো বেশী ভয় পেয়েছি। জানতাম রঞ্জিত আমার কোন ওজর আপত্তি না শুনেই বিয়ে করত। কিন্তু পরে এই চামড়ার রোগ যদি সে দেখত ছেলেমেয়েদের মধ্যে নেমেছে তাহলে আর তার দুঃখের শেষ থাকত না। পরে যাতে তাকে অনুতাপ করতে না হয় সেই জন্যেই আমাকে এই অভিনয় করতে হয়েছে।

—তার মানে তুমি আর বিয়ে –

—করব না। তাই ঠিক করেছি এম, এ-টা পড়ব। দরকার হলে বি. টি. পাশ করে যাহোক্ একটা চাকরী নেব। বাবা যতদিন আছেন ওঁকে দেখাশোনা করব, তারপর একলা জীবন যেমন করে হোক কেটে যাবে।

নির্ম্মল ঘন ঘন মাথা নাড়ে, কি জানি অনীতা, বুঝতে পারছিনা তুমি ঠিক করেছ কিনা।

—এছাড়া আমার আর করার কিছু ছিল না। তবে দোহাই আপনার, এ কথা কাউকে জানাবেন না।

নির্ম্মল কোন উত্তর দিতে পারে না। অনীতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, নির্ম্মলদা, রঞ্জিত ভাল আছে তো ?

—সত্যি মিথ্যে কি করে বলব, তবে মার্জারীর সঙ্গে ওর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। বোধ হয়—

অনীতার দিকে তাকিয়ে নির্ম্মলের কথা বন্ধ হয়ে যায়। চোখের জলে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে।

নিস্ফল অভিমানে নির্ম্মল বলে, এ কাজ তুমি কেন করলে অনীতা, সত্যি কথাটা বলা তোমার উচিত ছিল।

উচ্ছ্বসিত কান্নায় অনীতা ভেঙ্গে পড়ে, না নির্ম্মলদা, এই ঠিক হয়েছে ; আপনি আমার চোখের জল দেখে ভাবছেন নিজের ভুলের জন্য আমি কষ্ট পাচ্ছি। কষ্ট হয়ত পাচ্ছি, সত্যি কথা, কিন্তু সে বিধাতার বিধানে। তবু এরই মধ্যে সান্ত্বনা আছে এই ভেবে, যে যাকে

আমি সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছি তার মনটাকে অযথা ভারী করে তুলিনি নিজের স্বার্থের জন্যে।

নির্ম্মলও আর চোখের জল গোপন করাব কোন চেষ্টা করে না। সবিস্ময়ে অনীতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ভাবে, রঞ্জিত ঠিকই চিনেছিল, সত্যিই আশ্চর্য্য মেয়ে অনীতা।